বিবাহ-পাঠ
শাইখ মাহমুদ আল-মিসরী
ডা. শামসুল আরেফীন

বিবাহ প্রস্তুতি নিয়ে ডা. শামসুল আরেফীনের স্পেশাল কোর্স 'Marriage Preparation' এর আয়োজন করা হয়েছে Aslaf Academy এর পক্ষ থেকে। কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ঘুরে আসুন-

বিবাহ-পাঠ

শাইখ মাহমুদ আল-মিসরী
ডা. শামসুল আরেফীন

ভেতরের পাতায়

শুরু

ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আগাম-সমস্যা এড়ানোর এবং উদ্ভূত-সমস্যা নিরসনের নির্দেশনা রয়েছে। জীবনের যতগুলো সেক্টরের মুখোমুখি মানুষকে হতে হয়, সবগুলো। ব্যক্তিগত-শারীরিক-মানসিক-পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-আইনী-রাষ্ট্রীয়—এমন প্রতিটি পদক্ষেপেই ইসলাম সমস্যা এড়িয়ে সমাধানের পথ দেখায়। কেননা ইসলাম কোনো সৃষ্টির বানানো নয়। ইসলাম এমন একজনের দেয়া, যিনি আমাদের বায়োলজির স্রষ্টা, আমাদের সাইকোলজির স্রষ্টা, আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের স্রষ্টা, স্থান-কালের স্রষ্টা, প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টা (law of nature), সকল দৃশ্য-অদৃশ্য সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনিই এমন একটা যাপন-সিস্টেম মানুষকে দিয়েছেন, যা মানুষ-প্রাণিজগত-উদ্ভিদজগত-পরিবেশ-সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য বজায় রেখে নিশ্চিন্ত-প্রশান্ত জীবনের খোঁজ দেবে, আর মৃত্যুর পরের জীবনে মহাসফলতা নিশ্চিত করবে। বিপরীতে মানুষের রচিত ও গবেষণালব্ধ জীবন-দর্শন আমাদের বায়োলজি-বিরুদ্ধ, মনঃস্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ, পরিবেশ-বিধ্বংসী, জগতের ভারসাম্য নষ্টকারী, অসুস্থ ভবিষ্যতের হাতছানি।

বিবাহ ইসলামের এমন এক বিধান, যা দেহ-মন-আত্মা-প্রজন্ম-সমাজ-পরিবারের সুস্থতা নিশ্চিত করে। বিপরীতে বিবাহের অনুপস্থিতি বা বিবাহ-প্রক্রিয়ার জটিলায়ন জন্ম দেয় শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, পরিবার-সমাজে অস্থিরতা, হতাশাগ্রস্ত অসুস্থ প্রজন্ম তৈরী করে; পশ্চিমা সমাজ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেখুন, ২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশুর জন্ম বিবাহ-ছাড়া (out-of-wedlock)।[১] তাহলে আজ থেকে ২০/৩০ বছর পর এই শিশুগুলো যখন এডাল্ট হবে তখন পশ্চিমের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক থাকবে জারজ। [ক][২]

---

[১] https://twitter.com/spectatorindex/status/988307897955237888?lang=en

[২] [ক] [খ] এই পয়েন্টগুলো দেয়া এজন্য যে, সামনে যখন এই [ক] আবার পাবেন, তখন পিছনের এই আলোচনাটার সাথে মিলিয়ে নেবেন।

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
France	৫৯.৭%
Bulgaria	৫৮.৬%
Sweden	৫৪.৯%
Portugal	৫২.৮%
Netherlands	৫০.৪%
Belgium	৪৯%
UK	৪৭.৯%
Hungary	৪৬.৭%
Spain	৪৫.৯%

দেশ	মোট জন্মের কত শতাংশ
Ireland	৩৬.৬%
Germany	৩৫.৫%
Romania	৩১.৩%
Italy	২৮%
Poland	২৫%
Croatia	১৮.৯%
Greece	৯.৪%
USA[১]	৪৮%

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-দল আমেরিকার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত জন্ম নেয়া ৫ হাজার শিশুর উপর গবেষণা পরিচালনা করেন। বিয়ে ছাড়া গঠিত পরিবারকে বলা হয় 'ভঙ্গুর পরিবার' (fragile families)।[২] আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশু এই বিয়ে-ছাড়া বাবা-মায়ের সন্তান। ফলাফলের সারাংশ হলো—

ভঙ্গুর পরিবারে সন্তান পরিচর্যা ও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীনতার দরুণ এসব সন্তানের—

- ☑ আইকিউ কম (lower cognitive test scores)
- ☑ আক্রমণাত্মক আচরণ
- ☑ স্কুল থেকে ঝরে পড়ার দ্বিগুণ সম্ভাবনা (ড্রপ আউট)

[১] Knot Yet: The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America, National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, National Marriage Project at the University of Virginia এর বরাতে Ezra Klein (March 25, 2013). Nine facts about marriage and childbirth in the United States. Washington post.

[২] LaVar Young (Aug 16, 2011). Fragile Families: Most Children Born Out of Wedlock Aren't OK. HuffPost.

✅ সম্ভাবনা এটাই যে, এই শিশুরাও বড় হয়ে একই চক্র ঘটাতে থাকবে।

এই গবেষণা-শেষে প্রস্তাবনা দেয়া হয়, 'অবিবাহিত দম্পতি' হবার ব্যাপারে (লিভ টুগেদার) সমাজে উৎসাহ দেয়, এমন বিষয়গুলোকে আবার ভেবে দেখতে হবে বিজ্ঞানীদের। (The study suggests that our society reconsider policies that encourage couples to remain unmarried.)

কী বুঝা গেল? বিবাহ ছাড়া সন্তান যে দেশে অর্ধেক, তাদের ভবিষ্যত অস্থির না সুস্থির? এভাবেই ইসলামের প্রতিটি বিধান আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে প্রশান্তিময় ইহজীবন ও পরজীবন দেবার জন্য। আজ পশ্চিমা বস্তুবাদী গবেষণা কীসের দিকে ইঙ্গিত করছে? যাকে তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করে, সেই ধর্মীয় বিধানের দিকেই তো, নাকি? এই একটা বিধানকে বাধ্যতামূলক করে ইসলাম ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয়-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মহাসমস্যাকে পাশ কাটানোর রাস্তা দেখিয়েছে। এভাবেই প্রতিটি বিধানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সমাজের একই চিত্রায়ন দেখানো সম্ভব।

বিয়ের সঠিক সময়

বিগত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিয়ে ব্যাপারটা মাঝবয়েসে এসে ঠেকেনি। ১৯৬০ সালেও মেয়েদের প্রথম বিয়ের গড় বয়স ছিল ২০.৩ আর পুরুষের ২২.৮ বছর। কিন্তু ২০১০ সালে এসে এই গড় দাঁড়ায় মেয়েদের ২৫.৮ আর ছেলেদের ২৮.৩ বছরে।[১] মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিমা বিশ্বে এবং গত শতকের শেষ-চতুর্থাংশে এশিয়ায় বিয়ে পেছানোর হিড়িক ওঠে। বিষয়গুলো একটু বোঝার আছে। এর কারণ হলো—

- ☑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আগ্রাসী বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উত্থান
- ☑ সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় প্রভাব বিস্তার
- ☑ বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দুই মেরুতে ভাগ হয়ে যায়। আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক, সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এই দুই বিশ্বব্যবস্থা, যাকে আমরা স্নায়ুযুদ্ধ নামে চিনি। মহাকাশ বিজয়াভিযান থেকে নিয়ে জলে-স্থলে আধিপত্য বিস্তার, কোনোখানেই বাকি নেই। পরস্পরকে অর্থনৈতিকভাবে টেক্কা দেয়ার প্রচেষ্টাও থেমে নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই বোঝা গিয়েছিল নারীদেরকে কারখানায় আনার লাভটা। পুরুষদের যেতে হয়েছিল যুদ্ধে। যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও কারখানাগুলোতে নারীকর্মী ছিল প্রচুর, কেননা পুরুষ নিহত-নিখোঁজ ছিল বহু। সেসময়কার তিনটি পোস্টার দেখলেই বুঝবেন, নারীদেরকে কারখানামুখী করবার ব্যাপক প্রোপাগান্ডা। একটি বিখ্যাত পোস্টার "We Can Do It!", ১৯৪৩ সালে বানিয়েছিলেন J. Howard Miller নারীকর্মীদের

---

[১] Copen et.al. (2012), National Health Statistics, 'First Marriages in the United States:' Data from the 2006-2010 Natinal Survey of Family Growth'.

উৎসাহ ধরে রাখার জন্য। আরেকটা বিখ্যাত ক্যারেক্টার তৈরি করা হয়েছিল, যার নাম Rosie the Riveter, আমেরিকা-বৃটেনে অস্ত্র ও সামরিক ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য কারখানায় কর্মরত নারীদের গ্লোরিফাই করে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে নারীরা ব্যাপকভাবে এসবে অংশ নেয়।

মজা পেয়ে গেল মালিকেরা, নারীদের শ্রমবাজারে রাখাটা পুঁজিপতিদের পক্ষে ব্যাপক লাভজনক সাব্যস্ত হলো।

এক. বেতন কম দিতে হতো। যার প্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালে করতে হয়েছিল 'সমান বেতন আইন'। [খ]

দুই. চাকুরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। মেয়েদের জন্য চাকরি অপশনাল, আর পুরুষের তো 'না হলেই নয়'। ফলে, পুরুষরা আগের চেয়ে কম বেতনেও শ্রম দিতে তৈরি থাকে। [গ] ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। (Hernandez 1993, Zill & Nord 1994)

পুঁজিপতিরা তো এটাই চায়। বেতন কম দিলে পুঁজিপতির পকেটে মুনাফা থাকবে বেশি। তাহলে নারীদের এখন শ্রমবাজারে ধরে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। আর নারীদের শ্রম ধরে রাখতে হলে করতে হবে তিনটি কাজ—

- ☑ পরিবার গঠন-কে পেছাতে হবে স্বাবলম্বী হবার নামে। নারীদেরকে পরিবারমুখী থেকে ক্যারিয়ারমুখী করতে হবে। [ঘ] চাকরি, ক্যারিয়ার—এসবকে মর্যাদার কাজ হিসেবে বুঝাতে হবে।
- ☑ 'আগে আগে বিয়ে'-কে ভিলেন বানাতে হবে। [ঙ]
- ☑ বিয়ে, গর্ভধারণ, বাচ্চাপালন-কে ছোট ও ঘৃণ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেন এগুলো করতে নারী অনীহা বোধ করে। [চ]

সমাজতন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতার ময়দানে আবার ফিরিয়ে আনা হলো 'নারীবাদী আন্দোলন'-কে। আগের ঊনবিংশ শতক জুড়ে চলা নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম ওয়েভের আপাত সমাপ্তি ঘটেছিল আমেরিকার নারীদের ভোটাধিকার দেবার মাধ্যমে সেই ১৯২০ সালে। ৬০-এর দশকে আবার চাঙা করে তোলা হলো ৪০ বছর আগের সেই হাইপ। সমাজতন্ত্রও একই কৌশল নিতে দেরি করল না। আসলে সমাজতন্ত্রও একধরনের 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' বৈ কিছু না। পার্থক্য কেবল ওখানে পুঁজি হলো পুঁজিপতিদের হাতে; আর এখানে পুঁজি কমিউনিস্ট পার্টির হাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ১৯৪৯ সালে Simone de Beauvoir-এর

'Second Sex' ব্যাপক সাড়া ফেলল।

১৯৬৩ সালে Betty Friedan-এর 'The Feminine Mystique' প্রকাশিত হয়। ৩ বছরে বিক্রি হয় ৩০ লক্ষ কপি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল : সন্তানপালন ও ঘরোয়া কাজকাম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে, এটা। আইডিয়াটা নতুন না হলেও, ৩০ লক্ষ নারী পাঠকের কাছে আওয়াজটা পৌঁছে গেল। বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, তারা আসলে অসুখী। গড়ে উঠল আন্দোলন। এবার ফোকাস আর রাজনৈতিক সমতা না, সামাজিক সমতা। দাবিগুলো ছিল যৌনতা ও সম্পর্ক, গর্ভপাতের অধিকার, ঘরোয়া কাজ—এসব কেন্দ্রিক। অর্জনগুলো দেখলেই বুঝবেন কী নিয়ে আন্দোলন চলছিল—

- ☑ সমান বেতন আইন, ১৯৬৩ : মানে এর আগে সমান বেতন দেয়া হচ্ছিল না, আগেই বললাম। [খ]
- ☑ বিবাহিতা ও অবিবাহিতাদের জন্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমোদন। [চ]
- ☑ শিক্ষার সমানাধিকার : (টাইটেল ৯) আর্লি বিয়েশাদীর কফিনে শেষ পেরেক। [ঙ]
- ☑ ১৯৭৩ সালে Roe vs Wade কেস দ্বারা নারীর প্রজননের স্বাধীনতা অর্জন। [চ]

১৯৬০-এর দশকের শুরুতে আরম্ভ হয়ে ১৯৮০-এর দশকের শেষ অব্দি ছিল সেকেন্ড ওয়েভের সময়কাল। সেকেন্ড ওয়েভের চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্দোলন কিছুটা উগ্রতায় পরিণত হয়, এবং সমাজে নারীবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি করে। নিজেদেরকে শারীরিকভাবেও পুরুষের সমকক্ষ দাবি করার ও নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য প্রত্যাখ্যানের একটা ম্যাসেজ উঠে আসে। ১৯৬৮ সালে 'মিস আমেরিকা' যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেখানে নারীবাদীরা জমায়েত হয়, এবং ব্রা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে। পুরুষের চোখে যা যা নারীর প্রতীক সেগুলো পরিত্যাগ করার একটা নমুনা।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। একক সফল বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে 'আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদ' বিজয়ী হয়। নারীবাদ হয়ে গেল পুঁজিবাদের লাভজনক প্রোজেক্ট। নারীবাদের পালে সব ধরনের ফুঁ এখন পুঁজিবাদই দেয়।[১] Cambridge University-র gender studies-এর প্রফেসর Nancy Fraser লেখেন—

'পুরুষ জীবিকা উপার্জন করবে, নারী ঘর সামলাবে—এই পরিবার-কাঠামো (male breadwinner-female homemaker family) ছিল রাষ্ট্রায়ত্ব পুঁজিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। নারীবাদের নামে আমরা এই কাঠামোটার সমালোচনা করেছিলাম। এই সমালোচনা এখন কাজে লাগাচ্ছে কর্পোরেট বেসরকারি পুঁজিবাদ (flexible capitalism)। কেননা বেসরকারি পুঁজিবাদ নির্ভরই করে নারীর শ্রমের উপর, বিশেষ করে সেবা ও শিল্প খাতে নারীর কমমূল্যের শ্রমের উপর। এই শ্রম কেবল তরুণী অবিবাহিতারা দেয় তা না, বরং বিবাহিতা ও মায়েরাও দিচ্ছে। কেবল কট্টর নারীবাদীরাই দেয় তা না, বরং সব জাতির মেয়েরাই দিয়ে চলেছে। সারা দুনিয়াতেই যেহেতু মেয়েরা শ্রমবাজারে বানের মতো আসছে, আগের সেই পরিবার-কাঠামো বদলে হয়েছে 'দুই রোজগেরে' পরিবার (two-earner family), নারীবাদের কারণে।'[২]

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হলো—

- ☑ বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করা
- ☑ ভোক্তা সৃষ্টি করা
- ☑ শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা

এই তিনটি লক্ষ্য অর্জনে তারা দুনিয়াজুড়ে কী করেছে দেখুন—

---

[১] ***How feminism became capitalism's handmaiden - and how to reclaim it,*** Nancy Fraser [https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal]

***Feminism, Capitalism, and the Cunning of History*;** Nancy Fraser, American critical theorist, feminist, and the Henry A. and Louise Loeb Professor of Political and Social Science and professor of philosophy at The New School in New York City.

[২] How feminism became capitalism's handmaiden - and how to reclaim it, Nancy Fraser

* বাজারে নতুন ভোক্তা সৃষ্টি করা
- নারীকেও ক্রেতা বানাও, ভোক্তা বানাও। why should boys have all the fun...
- আগে পরিবার ইউনিট হিসেবে ক্রেতা ছিল, এখন স্বামী-স্ত্রী স্বাধীন দুই ক্রেতা।
* শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা
- চাকরির জন্য প্রার্থী বাড়াও। নারীদের শ্রমবাজারে নিয়ে এসো পুরুষের সাথে নারীর অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করো।
* নতুন ব্যবসা সৃষ্টি করা
চাহিদা যারা পূরণ করছে (পরিবার ও সমাজ),
- তাদেরকে সরিয়ে দেয়া বা
- পৃথক করে দেয়া বা
- একত্র হতে না দেয়া
সেই চাহিদা নিয়ে পণ্য ছাড়ো, নতুন ব্যবসা সৃষ্টি করো।
নারীকে নির্ভরশীল না রেখে স্বাবলম্বী করা
নারীশিক্ষা
নারী ক্ষমতায়ন
নারীপ্রগতি
ছেলেদের স্বাবলম্বী হওয়া পেছাও। পরিবার গঠন পেছাও
দীর্ঘসূত্রী কারিকুলাম
চাকরির কৃত্রিম প্রতিযোগিতা

উর্ধ্বমুখী ও একমুখী
মুনাফা প্রবাহ
৫০% সম্পদ
১% মানুষের হাতে
গরীব
আরও
গরীব
ধনী
আরও
ধনী
বছরে...
৭০০০০ কোটি ডলারের স্বাস্থ্য ব্যবসা
১৩৪৪০০ কোটি ডলারের এলকোহল ব্যবসা
৪৩৫০০ কোটি ডলারের ড্রাগ ব্যবসা
৯৭০০ কোটি ডলারের পর্নব্যবসা
যৌনকাজে ব্যবহৃত মানব পাচার থেকে ৯৯০০ কোটি ডলার
পতিতাব্যবসা বছরে ১৮৬০০ কোটি ডলারের
কেবল Erectile Dysfunction Market-ই ২০২৪ সালের মধ্যে
৪২৫ কোটি ডলারে পৌঁছবে বছরে।
যৌনবাহিত রোগের ওষুধের মার্কেট ২০১৭ সালে সারা দুনিয়ায় প্রায় ৩৩০০ কোটি ডলার,
২০২৫ সালের মধ্যে হবে ৮৬০০ কোটি ডলার।
ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বক্স অফিস ব্যবসা ৩৮০০ কোটি ডলার
বছরে ৩৩০০ কোটি ডলারের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসা
ক্যাবল টিভি ও স্যাটেলাইট ব্যবসা বছরে ২৮৬০০ কোটি ডলার
উচ্চতর শিক্ষার মার্কেট ২০১৬ সালে ছিল ৫১.৮ বিলিয়ন ডলারের।
যা ২০২৫ সালে হবে বছরে ১০৫.৭২ বিলিয়ন ডলারের।

এর ফলে পশ্চিমের গণমানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। ফলে এখন যা হলো—

১. পুঁজিবাদ মানুষকে ভোগবাদী বানিয়ে নিয়েছে, নাহলে তার পণ্য ভোগ করবে কে? ফলে পুঁজিপতিদের তৈরি নিত্যনতুন পণ্যের দরকার পড়ছে জীবন উপভোগের জন্য। এইসব নতুন নতুন চাহিদা নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে। [ঘ]

২. ভোগবাদী মানুষ ভোগের সামর্থ্য অর্জনকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। ক্যারিয়ার নারী-পুরুষ সকলের মা'বুদ। টেস্টোস্টেরোন-বিধৌত যৌবন ভোগে কাটিয়ে 'বিয়ে' এখন মধ্যবয়সের (৩৫-৪০) চিন্তা। [ঘ]

৩. নারী-পুরুষ উভয়েই এখন পুঁজিবাদের বাজার, উভয়েই ক্রেতা। ফলে বিয়েটা এখন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নয়, দৈহিক প্রয়োজন নয়, বিয়ে এখন জাস্ট পার্টনারশিপ আর শেষ-বয়সের সঙ্গী খোঁজা। ফলে বিয়ে যত দেরিতে করা যায়, যত ভোগ করে ও ভোগের সামর্থ্য অর্জনের পর করা যায় তত ভালো। [ঘ]

৪. আমেরিকায় ডিভোর্স বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। গড়ে একটা ডিভোর্সে খরচা হয় ১৫ হাজার ডলার।[১] যা বাড়তে পারে রাজ্যভেদে; উকিল খরচ, সন্তান আছে কি না, যৌথ প্রোপার্টি আছে কি না, কতদিন লাগছে নিষ্পত্তি হতে—এসব মিলিয়ে। বিয়ের চাহিদা যদি ভিন্নভাবে মেটে, কী দরকার এসব হ্যাপা-র?

৫. লিভ-টুগেদার তাদের সমাজে একটা অনুমোদিত কালচার। সারাজীবন বিয়ে না করলেই কী যায় আসে। বিকল্প তো আছেই। বিয়ে মানে তো বাধ্যবাধকতা, আর লিভ-টুগেদারে ওসব ঝামেলা নেই। [ক] ১৯৭০ সালে আমেরিকায় এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৫ লাখ, ২০০২-এ এসে সেটা হলো ৪৯ লাখ।[২]

---

[১] Erin McDowell (Aug 1·2019). The average cost of getting divorced is $15,000 in the US — but here's why it can be much higher. Business Insider.

[২] US Census Bureau. 2003. 'Unmarried-Couple Households, by Presence of Children: 1960 to Present,' Table UC-1, June 12, 2003.

৬. নারীবাদের সুবাদে বিয়ে, সন্তানধারণ—এসব পশ্চিমের মেয়েদের কাছে ঝামেলা। ক্যারিয়ারের শত্রু এগুলো। [চ]

৭. সন্তান নিলেও বিয়ে না করেই তো নেয়া যায়। পশ্চিমা বিশ্বে জন্মানো অর্ধেক শিশু 'বিয়ে-ছাড়া'। [ক]

এবার একটা রিসার্চ দেখাই। যদিও বেশ পুরনো, ২০১৩ সালের। University of Virginia-এর আন্ডারে National Marriage Project-এর একটা ক্যাম্পেইন হয়—

'National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy'. তারা একটা রিপোর্ট করে 'Knot Yet: The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America' নামে। রিপোর্টের সারাংশ হলো—

- ☑ ২৫ বছর বয়সে, ৪৪% নারীর প্রথম সন্তান হয়। কিন্তু ২৫ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করে ৩৮% নারী।[ক]
- ☑ প্রথম শিশুদের ৪৮% হলো কুমারী মায়ের সন্তান। [ক]
- ☑ কুমারী মায়েদের ২৩% টিনেজার। ৬০%-এর বয়স ২০-এর ঘরে।
- ☑ যেসব নারী ৩০ বছর বয়স অব্দি বিয়ে না করে থাকে তারা বছরে $১৮,১৫২ (ভার্সিটি-পাশ) $৪,০৫২ (কলেজ-পাশ) বেশি আয় করে, ২০-এর আগে যারা বিয়ে করেছে তাদের চেয়ে। [ঘ]
- ☑ **৩০ বছরের ভেতর যে-সব ছেলের বয়স, তাদের মধ্যে যারা ২০-এর ঘরে বিয়ে করেছিল, নিজ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুপাতে তাদের ব্যক্তিগত ইনকাম সর্বোচ্চ। মধ্য ৩০-এও যারা বিয়ে করেনি তাদের ইনকাম সর্বনিম্ন, এমনকি যারা ২০-এর আগে বিয়ে করেছে, তাদের চেয়েও কম।**

- ☑ চমকপ্রদ একটা ফল এসেছে—আগের যুগে যে বয়সে তরুণ-তরুণীরা বিয়ে করত, ঠিক একই বয়সে এখন তারা প্রথমে লিভ-টুগেদারে (first coresidential relationship) প্রবেশ করছে। পার্থক্য এটাই যে, আগে বিয়ে করত, এখন বিয়ে করে না। আগে দায়িত্ব নিত, এখন নেয় না। [ক]
- ☑ সন্তান আছে এবং ২০-এর ঘরে বয়স, এমন লিভ-টুগেদার দম্পতির ৪০% সন্তানের বয়স ৫ হবার আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যা বিবাহিত দম্পতির চেয়ে ৩ গুণ বেশি। [ক]
- ☑ শুধু ভার্সিটি-পাশ নারীই দেরিতে বিয়ে করছে তাই না, ওয়েটারের চাকরি করে এমন নারীরাও ৩০-এর আশেপাশে বিয়ে করে। [ঘ]
- ☑ পশ্চিমের কালচারটাই এখন এমন, বিয়েকে তারা দেখে গাঁথনির শেষ ইট (capstone) হিসেবে, ভিতের ইট (cornerstone) হিসেবে না। প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের শুরু হিসেবে না, বরং সব কাজ সেরে শেষ কাজ হিসেবে বিয়েকে রাখে।
- ☑ ৯১% তরুণ-তরুণী ভাবে, সম্পূর্ণ আর্থিকভাবে স্বাধীন না হয়ে বিয়ে করা যাবে না।
- ☑ ৯০% মনে করে শিক্ষাজীবন শেষ না করে বিয়ে করা যাবে না।
- ☑ ৫১% মনে করে 'ক্যারিয়ার অবশ্যই আগে'। তারা ভাবে ১/২ বছর ফুলটাইম চাকরি করে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে। [ঘ]

সামাজিক পলিসি নিয়ে রিসার্চ করে—এমন একটি থিংক-ট্যাঙ্ক Urban Institute-এর একজন রিসার্চার Robert Lerman ও তাঁর সহকর্মী Avner Ahituv পেয়েছেন যে, বিয়ে একজন পুরুষের আয়কে ২০% বাড়ায়। ২০-২৮ বছর বয়সী বিবাহিত লোকেরা জীবন নিয়ে "highly satisfied" হবার সম্ভাবনা বেশি। Authentic Happiness বইয়ে পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির

মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর Martin E. P. Seligman, Ph.D বলেন : 'বহু রিসার্চ দেখিয়েছে যে, একটা ভালো চাকরি পাবার চেয়ে বিয়ে করাটা বেশি সুখ নিশ্চিত করে।'

University of Virginia-এর সমাজবিদ Brad Wilcox এই রিসার্চের co-author। National Marriage Project-টাও উনিই চালান। তিনি বলেন: 'আসলে মানুষ তো আলাদা আলাদা। যদি আপনার লক্ষ্য হয় পেশাগত এবং অর্থনৈতিক সাফল্য, তাহলে দেরিতে বিয়ে করাটাই আপনার জন্য বেস্ট। আর যদি সন্তানসন্ততি নিয়ে ধার্মিক জীবন যাপনের চিন্তা করেন, তাহলে বিশের ঘরেই বিয়ে-সন্তান সেরে ফেলা উচিত।'[১]

ঠিক এই পয়েন্টেই পুঁজিবাদী ভোগবাদী বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামের বিরোধ। পশ্চিমা সভ্যতা কৃত্রিম দ্বীন (জীবনব্যবস্থা)। আর ইসলাম ফিতরাতের (সহজাত স্বভাবসুলভ) দ্বীন। পশ্চিমা সভ্যতার লক্ষ্য মুনাফা আর ভোগ, জুলুম-বঞ্চনাই এ সভ্যতার হাতিয়ার। ইসলামের লক্ষ্য ইহকাল-পরকালে মুক্তি, হাতিয়ার ইনসাফ ও অধিকার বুঝিয়ে দেয়া। পশ্চিমা সভ্যতা নারী-পুরুষের বায়োলজি-বিরুদ্ধ, সাইকোলজির বিপরীত। আর ইসলাম সংগতিপূর্ণ। পশ্চিমা সভ্যতা উপর থেকে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে বিচ্ছিন্ন মানবসত্তাকে। আর ইসলাম মানবসত্তাকে করে রাখে 'সহস্র বন্ধনের মাধ্যমে মহানন্দময়'। মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মিকভাবে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে—যেটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি।

বিয়ের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়স, আয়-রোজগার, চাহিদা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির একটা সম্পর্ক আছে। দেরি করলে শারীরিক-মানসিক নানা সমস্যা। আবার আয়ের একটা বিষয় আছে, যেটা ইসলামে আরও বেশি জরুরি, কেননা ইসলাম পুরুষকে পরিবারের ভরণপোষণে বাধ্য করে। তাহলে ব্যালেন্সটা কীভাবে হবে? ব্যালেন্স ইসলাম করেই রেখেছে, ইসলামের লক্ষ্যই হলো ইনসাফ। মানুষ যেন তার নিজের বায়োলজি-সাইকোলজি দ্বারা আরেকজন মানুষ, পরিবার, সমাজের সাথে ইনসাফ করতে পারে, সে ব্যবস্থাপনা তৈরি করে দেয়াই ইসলামের উদ্দেশ্য।

---

[১] Dylan Matthews (April 4, 2013). People who marry young are happier, but those who marry later earn more. Washington post.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত—

> তিনি বলেন, 'কোনো এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। (বিয়ের খরচ বহনের মতো) আর্থিক সামর্থ্য আমাদের ছিল না [১]।' রাসূল বললেন, "হে যুব সমাজ! [২] তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের যে লোকের বিয়ের সামর্থ্য নেই [৩] সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম তার যৌনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।"'[১]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলছেন—

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

> 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও [৪] এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় [৫], তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে [৩] যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।'[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ وُلِدَ لَه وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَه وَأَدَبَه فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيْهِ

> 'তোমাদের মধ্যে যার কোনো (পুত্র বা কন্যা) সন্তান জন্ম হয় সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়; যখন সে বালেগ অর্থাৎ সাবালক/সাবালিকা হয় [৬], তখন যেন তার বিয়ে দেয়; যদি সে বালেগ হয় এবং তার বিয়ে না দেয় তাহলে সে কোনো পাপ করলে উক্ত পাপের

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৮৪৫; বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১৯০৫, ৫০৬৫, ৫০৬৬; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৪০০; তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১০৮১; নাসায়ী, হাদীস-ক্রম : ২২৩৯, ২২৪০, ২২৪২

[২] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ৩২

> *দায়ভার তার পিতার উপর বর্তাবে [৭]।'*[১]

ইসলাম হলো ফিতরাতের বিধান; মানবসত্তার জন্য যা যথোপযুক্ত এবং যা মানা সম্ভব, তাই বিধান করে দিয়েছে ইসলাম। এজন্য বিয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট বয়স উল্লেখ না করে ইসলাম কয়েকটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে। এবং সেই শর্তগুলো অর্জন করার জন্য আশপাশের লোকদের দায়িত্ব দিয়েছে, একা ছেলেটার উপর ছেড়ে দেয়নি। উপরের তিনটা টেক্সট লক্ষ করলে যে পয়েন্টগুলো উঠে আসে—

[১] সামর্থ্যবান যুবকের বিয়ে করে ফেলা উচিত।

[২] যুবসমাজ বলতে এখানে কাদের বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেন, 'আমাদের লোকদের মতে, যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা বালেগ[২] হয়েছে এবং ৩০ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি।[৩] অর্থাৎ নবীজি ﷺ রাফলি ১৩/১৪/১৫ থেকে নিয়ে ৩০-এর মধ্যে অবিবাহিত থাকাকে পছন্দ করেননি।

[৩] যার সামর্থ্য একেবারেই নেই, তার রোযা রাখা দরকার; সামর্থ্য

---

[১] বাইহাকী, শুআবুল ঈমান, ১১/১৩৭ [৮২৯৯]। সনদ দুর্বল।

[২] মাসিক আল-কাউসার, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পর্বের সূত্রে।
ছেলে এবং মেয়ে—উভয়ের বালেগ হওয়ার বয়সসীমা ও আলামত শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রয়েছে। কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে বালেগ হওয়ার নির্দিষ্ট আলামত পাওয়া গেলে বা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় সে পৌঁছে গেলেই তাকে বালেগ গণ্য করা হবে এবং তখন থেকেই শরীয়তের হুকুম-আহকাম তার উপর প্রযোজ্য হবে। ছেলেদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো : ক) স্বপ্নদোষ হওয়া। খ) বীর্যপাত হওয়া। আর মেয়েদের বালেগ হওয়ার আলামত হলো : ক) স্বপ্নদোষ হওয়া। খ) হায়েয (ঋতুস্রাব) আসা। গ) গর্ভধারণ করা। বালেগ হওয়ার এই নির্দিষ্ট আলামত যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে উভয়ের বয়স যখন হিজরী বর্ষ হিসাবে ১৫ বছর পূর্ণ হবে তখন প্রত্যেককে বালেগ বলে গণ্য করা হবে এবং ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর কোনো আলামত পাওয়া না গেলেও সে বালেগ বলেই বিবেচিত হবে।
প্রকাশ থাকে যে, কোনো ছেলে বা মেয়ের সাথে শরয়ী পর্দা করার হুকুম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকে। বরং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যখন কোনো ছেলের নারী-পুরুষ সম্পর্কিত বিষয়ে বোঝার বয়স হয়ে যায় তখন থেকেই তার সাথে পর্দা করতে হবে। আর মেয়েদের পর্দার বয়স শুরু হয় তার শরীরে মেয়েলী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার সময় থেকেই। যখন তাকে দেখলে কোনো পুরুষ আকর্ষণ অনুভব করে। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো এমন-বয়সী ছেলেমেয়েদের পর্দার ব্যাপারে সচেতন থাকা।
-আল-ইনায়া শারহুল হেদায়া : ৮/২০১; আদ্দুররুল মুখতার : ৬/১৫৩; তাফসীরু কুরতুবী : ১২/১৫১

[৩] http://www.ihadis.com/books/bukhari/chapter/67 তে ৫০৬৬ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা।

একটা শর্ত। শর্ত পুরা না হলে রোযা।

[৪] অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া সমাজের দায়িত্ব, সুতরাং, আবশ্যিকভাবে সামর্থ্যহীনকে বিয়ের শর্ত 'সামর্থ্য'-এর ব্যবস্থা করে দেয়াও—মানে, শর্ত পূরণের ব্যবস্থা করাও—সমাজের দায়িত্ব। ইসলাম একটা কংক্রিট সমাজের কথা বলে, যার দায়িত্ব অনেক। বর্তমান রাষ্ট্রচিন্তার অনেক কনসেপ্ট ইসলামী সমাজের উপর বর্তায়।

[৫] ন্যূনতম সামর্থ্য হলেই বিয়ে দিয়ে দেবে সমাজ। বাকিটুকু আল্লাহ দেখবেন।

[৬] বালেগ হলে (ছেলেদের স্বপ্নদোষ, মেয়েদের মাসিক ও দৈহিক পরিবর্তন, কোনো কিছু প্রকাশ না পেলে ১৫ বছর বয়স) পিতার দায়িত্ব বিয়ে দেয়া, যদি পিতার সামর্থ্য থাকে সন্তানকে সামর্থ্যবান করে দেয়ার। বালেগ হলে তাকে দ্রুত সামর্থ্যবান হবার শর্ত পূরণ করতে সাহায্য করবেন পিতা, এবং শর্ত পূরণ করে বিয়ে দেবেন। পিতা না পারলে সমাজ তাকে শর্ত পুরা করতে সাহায্য করবে।

[৭] দেরি করলে সন্তানের গুনাহের দায়ভার পিতার উপর বর্তাবে। এমন সতর্কবাণীও এসেছে।

সবগুলো সামনে নিলে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম দ্রুত বিয়েকে বাধ্য করেনি—
যেমনটা অনেকে বলে থাকেন। তবে বালেগ হবার পর দ্রুত সামর্থ্য অর্জন করে
বিয়ে করতে উৎসাহিত করেছে, এবং সেজন্য সমাজ ও পরিবারকেও দায়িত্ব
দিয়েছে। যত দ্রুত সামর্থ্য অর্জন সম্ভব ও সামর্থ্য অর্জনের পর যত দ্রুত সম্ভব।
নির্দিষ্ট না করে একটা রেঞ্জ বলে দিয়েছে ইসলাম—এর মধ্যে অবিবাহিত থাকা
যাবে না। একই সাথে ইসলাম এই দুই শর্ত পুরা না হলে বিয়ে দেয়া যাবে না,
তাও বলেনি। বালেগ বা বালেগা (তথা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে)
হবার আগেও বিয়ে সম্পাদিত হতে পারে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য।
কেননা পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে ক্ষেত্রবিশেষে আগে দেয়া
লাগতেও পারে, যেমন—

- ☑ মুমূর্ষু পিতা নাবালিকা মেয়েকে কারো দায়িত্বে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দুনিয়া থেকে যেতে চান।
- ☑ দরিদ্র পিতা সমাজের প্রভাবশালীদের কুদৃষ্টি থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে চান। বিয়ে দিয়ে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।
- ☑ দারিদ্র্যের কারণে কন্যার ভরণপোষণ দিতে না পারা। যেটা আমাদের দেশে মূল কারণ হিসেবে প্রস্ফুটিত।
- ☑ সন্তান বিগড়ে যাবার ভয়ে। ইত্যাদি।

প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তারা একসাথে না থাকতে চাইলে তারও রাস্তা আছে (খিয়ারে বুলুগ-এর বিধান)।[১] বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী যেটা দ্রুত, ইসলাম সেটার নির্দেশ করেছে। এজন্যই পরিস্থিতি-সাপেক্ষে বিয়ে কারো জন্য ফরয, কারো জন্য সুন্নাহ, কারো জন্য মুস্তাহাব, কারও জন্য মুবাহ, এমনকি কারও জন্য হারাম। এটা নির্ণিত হয় ব্যক্তির অবস্থা সাপেক্ষে। ঢালাওভাবে বাল্যবিবাহ অবৈধ করাটা যেমন সমাধান নয়, বিশেষত আমাদের মতো 'গরীব-অধ্যুষিত' 'নারীর জন্য অনিরাপদ' দেশে; আবার ১৫/১৬/১৭ বছর বয়সী কিংবা পর্নোগ্রাফি ও বলিউডি সংস্কৃতির মাঝে বড় হয়ে সব বুঝে ফেলে যৌন চাহিদা তৈরি হয়েছে যাদের, তাদেরকে জোর করে নাদান শিশুর কাতারে ঢুকিয়ে দেয়াও বাস্তবসম্মত নয়। সেই সাথে গণহারে নাবালেগ বা সদ্য বালেগদের বিয়ে দিতে জোরাজুরি করাও সমাধান নয়। সমাধান দিয়েছে ইসলামই, পরিস্থিতি-সাপেক্ষে যেটা প্রযোজ্য, আলিমদের পরামর্শে সেটা করা। বিস্তারিত জানতে জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ রচিত 'বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স : ইসলামী শরীয়ত বনাম আইয়ুব খানের আইন' আর্টিকেলটি পড়া যেতে পারে।[২]

তাছাড়া ইসলাম বিয়েকে সহজ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] (নাবালেগ/নাবালেগা বয়সে বিয়ের পর) যখন ছেলে এবং মেয়ে বালেগ/বালেগা হয়ে যাবে, তখন তারা যদি মুখে একথা বলে দেয় যে, 'আমরা এ বিয়েতে সম্মত নই' তাহলেই (নাবালেগ বয়সে তাদের কৃত) ঐ বিয়ে (শরয়ী দৃষ্টিতে) ছিন্ন হয়ে যাবে। 'বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স : ইসলামী শরীয়ত বনাম আইয়ূব খানের আইন', জাস্টিস আল্লামা তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ

[২] বাল্যবিবাহ ও বিয়ের বয়স : ইসলামী শরীয়ত বনাম আইয়ূব খানের আইন http://islamic-culture.faith/ইসলামে-বাল্যবিবাহ-ও-বিয়ে/

ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে যেটা সহজে সম্পন্ন হয়।' [১]

'যে বিবাহে খরচ কম, তা-ই বেশি বরকতপূর্ণ।' [২]

'যে সমাজে বিয়ে কঠিন হয়, সেই সমাজে ব্যভিচার সহজ হয়ে যায়।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সর্বোত্তম মোহরানা হচ্ছে—সহজসাধ্য মোহরানা।' [৩]

ছেলেপক্ষ	মেয়েপক্ষ
সামর্থ্যের মধ্যে মোহর [৪]	যৌতুক নেই।
লৌকিকতা-বর্জিত ওয়ালীমা। ওয়ালীমা ছেলেপক্ষের, মেয়েপক্ষের দায় নেই।	বরযাত্রী নেই।
বাগদান, পানচিনি, গায়ে হলুদের মতো অপচয় বিবর্জিত।	

কতটা সহজ করা হয়েছে তা বুঝাতে মাসিক আল-কাউসারে প্রকাশিত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম রচিত প্রবন্ধের কিছু অংশ আপনাদের খিদমতে তুলে দিচ্ছি— [৫]

---

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২১১৭; মুস্তাদরাকু হাকিম, হাদীস-ক্রম : ২৭৪২

[২] শুআবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস-ক্রম : ৬৫৬৬

[৩] বাইহাকী, হাদীস-ক্রম : ১৪৭২১

[৪] ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, বিয়ের জন্য কোনো লোকের নিকটে যদি মোহর আদায়ের মতো কিছু না থাকে এবং যদি সে কোনো নারীকে কুরআনের কোনো সূরার বিনিময়ে বিয়ে করে তবে তা জায়িয হবে। তার কর্তব্য হবে ঐ মহিলাকে সূরাটি শিখিয়ে দেয়া। হানাফী মতে এবং আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, বিয়ে জায়িয হবে ঠিকই, কিন্তু তাকে 'মাহরে মিছিল' পরিশোধ করতে হবে। 'মাহরে মিছিল' হলো পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের যে মোহরে বিয়ে হয়েছে, তার সমতুল্য। [আল-হিদায়া ইফা., খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-ক্রম : ৪২] উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরানা উচ্চহারে বাড়িয়ে দিয়ো না।' [ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৮৮৭]

[৫] ইসলামে মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধের গুরুত্ব, মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, আল-কাউসার, নভেম্বর ২০১৩

...সুতরাং এর জন্য খুব বেশি আচার-বিচার, উদ্যোগ-আয়োজন ও জাঁকজমকের দরকার হয় না। নেই কঠিন কোনো শর্ত ও দুর্ভর ব্যয়ের ঝক্কি। খরচ বলতে কেবল স্ত্রীর মোহর। আর আচার-অনুষ্ঠান বলতে কেবল সাক্ষীদের সামনে বর-কনের পক্ষ হতে ইজাব-কবূল। ব্যস, এতটুকুতেই বিবাহ হয়ে যায়। অতপর ওয়ালীমা করা সুন্নত ও পুণ্যের কাজ বটে, কিন্তু বিবাহ সিদ্ধ হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়। এ ছাড়া প্রচলিত কিছু কাজ কেবলই জায়েয পর্যায়ের। তা করা না করা সমান। করলেও কোনো অসুবিধা নেই, না করলেও দোষ নেই। কেননা বিবাহ শুদ্ধ হওয়া-না হওয়া কিংবা উত্তম-অনুত্তম হওয়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

উভয় পক্ষের জন্য এতটাই সহজ করা হয়েছে যাতে সমাজ ও বাবার পক্ষে পাত্রকে দ্রুত সামর্থ্যবান করা এবং পাত্র নিজেকে সামর্থ্যবান মনে করা সহজ হয়।

পাত্রী নির্বাচন

ইসলাম পরিবার গঠনের জন্য বিবাহকে অত্যাবশ্যকীয় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা তো করেছেই, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্যও প্রণয়ন করেছে কিছু বিধিনিষেধ এবং নিয়মাবলি। মানুষ যদি ঈমানের সাথে সেগুলো মেনে নিয়ে জীবন গঠন করতে পারে, তাহলে দাম্পত্যজীবন হবে মনকষাকষি-মুক্ত, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, চোখজুড়ানো, মনমাতানো।

প্রতিটি মুসলিম যুবকের মনের গহীন বাসনা হচ্ছে একজন পুণ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পাওয়া। যুবক নিজে যদি ফাসেকও হয়, যিনাকারীও হয়, সেও চায় তার স্ত্রী হিজাবী হোক, ধার্মিক হোক, নম্র-ভদ্র হোক। আকাঙ্ক্ষিত সেই সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য ইসলাম প্রণয়ন করেছে অভিনব এক পদ্ধতি। নবী কারীম ﷺ বলেন—

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

> *'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার দৈহিক সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারি। সুতরাং তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।'*[১]

পাঠক, আমার সাথে সাথে আপনিও একটু ভাবুন। নবী কারীম ﷺ আপনাকে প্রতীক্ষিত জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।' আর আল্লাহ তাআলা নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫০৯০; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৪৬৬

> *'যদি নবী তোমাদের সকলকেই পরিত্যাগ করেন তাহলে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে এর পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী। যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারী, ইবাদাতগোজার, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।'*[১]

আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র আয়াতেও মুমিন স্ত্রীর বিশেষ গুণটির (দ্বীনদারি) কথা উল্লেখ করেছেন, যা স্ত্রীর মধ্যে সবাই চায়। তাহলে সেই বিশেষ গুণটির গ্রহণযোগ্যতা কী পরিমাণ, চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যেটাকে কুরআনে উল্লেখ করেছেন, নবীজি ﷺ যে গুণের অভাবে সাহাবীদেরকে দিয়েছেন ক্ষতির সতর্কবাণী![২] তাই দাম্পত্যজীবনে অনাহূত ক্ষতি থেকে বাঁচতে স্ত্রী নির্বাচনের জন্য সর্বাগ্রে দেখা দরকার সেই বিশেষ গুণটি—'দ্বীনদারি'।

বিয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ

পাঠক, পাত্রীর বিশেষ বৈশিষ্টাবলি শোনার জন্য আপনি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। এর আগে আমরা আপনাকে কিছু প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। একে তাঁরা খাটো করে দেখেন। বিয়েকে যে বিশেষ উপকারিতার জন্য মানুষের জীবনে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা সেই বিশেষ উপকারিতার ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন।

তাঁরা বিয়েকে নারীদেহ ভোগ করা এবং শুধুই শারীরিক তৃপ্তির মাধ্যম মনে করেন। আবার কেউ মনে করেন, বিয়ে হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যম এবং সন্তানের আধিক্য নিয়ে আস্ফালন মাত্র। কেউ দেখা যাচ্ছে মনে করেন, বিয়ে হচ্ছে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটানো, নেতৃত্বদান এবং জনবলে নিজের দল ভারী করার এক মুখ্য সুযোগ। কেউ আবার মনে করেন, বিয়ে হচ্ছে শুধুমাত্র নিজের অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং মুমিনদের জনবল বৃদ্ধি পাওয়া। কেউ বৈবাহিক সম্পর্ককে শুধুমাত্র নিজেদের বাপ-দাদার পালন করে আসা প্রথা

---

[১] সূরা তাহরীম, আয়াত-ক্রম : ৫

[২] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন, তাফসীরু ইবনি কাসীর : ৮/১৮৭; উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়। বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৪৪৮৩ ও ৪৯১৬

হিসেবেই নিয়ে থাকেন।

খুব অল্প-সংখ্যক মানুষই এ ব্যাপারে সুবোধ জ্ঞান রাখেন। যাঁরা জ্ঞান রাখেন, তাঁরা মনে করেন, বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে বিশেষ এক প্রতিনিধিত্ব, অগাধ দায়িত্ববোধ, দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা, মানবিক সৌভাগ্যের পথে আত্মত্যাগ এবং জীবনকে নিরাপদ গতিপথে পরিচালনা করার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

> *‘হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।’*[১]

এক. দ্বীনদারি

পুণ্যবতী পাত্রীর বিশেষ গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দ্বীনদারি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ

> *‘একজন মুমিন দাসী মুশরিক (স্বাধীনা) মেয়ের চেয়ে উত্তম। যদিও সেই মুশরিক (স্বাধীনা) মেয়ে তোমাদেরকে (স্বীয় গুণাবলির মাধ্যমে) আকৃষ্ট করে।’*[২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ

> *‘পুণ্যবতী নারীদের জন্য (আমি নির্ধারণ করে রেখেছি) পুণ্যবান পুরুষ। আর পুণ্যবান পুরুষদের জন্য (নির্ধারণ করে রেখেছি) পুণ্যবতী নারী।’*[৩]

---

[১] সূরা হুজুরাত, আয়াত-ক্রম : ১৩

[২] সূরা বাকারা, আয়াত-ক্রম : ২২১

[৩] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ২৬

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

> *‘নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত; এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোক চক্ষুর অন্তরালেও তারা সেটার হেফাজত করে।’*[১]

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সতর্ক করে বলেছেন যে, দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে দাম্পত্যজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

দ্বীনদারি বলতে আমরা কী বুঝি? সাধারণত আমরা দ্বীন-ইসলামের পরিপূর্ণ সমঝদারি, ইসলামের ফযীলতপূর্ণ বিষয়াবলি এবং এর সমুন্নত শিষ্টাচারিতার কার্যত রূপ দান করাকেই বুঝে থাকি। মূলত এসব কারণেই নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি আগ্রহী হও। ফলে ছেলেরা (দ্বীনদার মেয়েকে পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করে) দাম্পত্য জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে। মেয়েরাও স্বামী, সন্তান এবং পরিবারের অধিকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করতে সক্ষম হবে।’[২]

ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও সৌন্দর্যের ওপর দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ—

নবী কারীম ﷺ ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও সৌন্দর্যের ওপর দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, এগুলো নশ্বর দুনিয়ার মতোই অনিত্য। পাঠক, আল্লাহ তাআলার কাছে শুধুমাত্র আপনার স্ত্রীর দ্বীনদারিই আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকবে।

এ-কারণেই নবী কারীম ﷺ বলেন—

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

> *‘দুনিয়া হচ্ছে উপভোগ্য সম্পদে পরিপূর্ণ। আর এখানে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।’*[৩]

[১] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৩৪

[২] হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় এমন কোনো বর্ণনা নেই। তবে বিবাহে উৎসাহপ্রদানমূলক হাদীসের আলোকে শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান এই মন্তব্য করেছেন।—আদাবুল খুতবাতি ওয়ায যিফাফ, পৃষ্ঠা-ক্রম : ৩২

[৩] মুসলিম, হাদীস-ক্রম :১৪৬৭, অধ্যায় : মাতৃদুগ্ধ পান

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সোনা-রুপা (মূল্যবান সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে রাখার সমালোচনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম বলেন, "তাহলে আমরা কোন সম্পদ ধরে রাখব?" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি তা জেনে তোমাদের বলে দিবো।" অতঃপর তিনি তার উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পেছন পেছন গেলাম। তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করব?" নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন—

لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ

> *"তোমাদের প্রত্যেকেই যেন কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী অর্জন করে।"*[১]

অন্য বর্ণনায় আছে, মুয়ায ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে নবী কারীম ﷺ বলেন—

قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ، وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ

> *'কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা আর পুণ্যবতী স্ত্রী, যে তোমাকে ইহকাল-পরকালের কার্যাবলি আঞ্জাম দিতে সহায়তা করে—এ সবই হচ্ছে মানুষের সঞ্চিত ধনভাণ্ডারের মাঝে সর্বোত্তম রত্ন।'*[২]

মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের মুখ্য বিষয় তিনটি। সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী কারীম ﷺ বলেন—

> *'(জীবনের অন্যতম) সৌভাগ্য হচ্ছে, একজন পুণ্যবতী স্ত্রী পাওয়া, যাকে*

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম :১৮৫৬, অধ্যায় : বিবাহ; শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে সনদ হাসান গরীব; সমার্থক বর্ণনা রয়েছে, তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩০৯০; সনদ সহীহ

[২] তাবারানী, আল মু'জামুল কাবীর : ৮/২০৫ [৭৮২৮]; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ৬/২৪৭ [৪১১৬]; মাজমাউয যাওয়ায়িদ লিল হাইসামী : ৪/২৭৩; সনদ যঈফ (দুর্বল)। ইমাম হাইসামী বর্ণনাকারী আলী ইবনু ইয়াযিদ হিলালকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন বলে উল্লেখ করলেও আসলে কেউই তা বলেননি। তবে আগের বর্ণনায় ইমাম তিরমিযী হতে শক্তিশালী সনদে সমার্থক বর্ণনা পাওয়া যায়।

> *দেখলেই তোমার হৃদয় প্রফুল্ল হবে। অনুপস্থিতির সময়ও তুমি স্বীয় ধন-সম্পদ এবং স্ত্রীর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে। আর (জীবনের) দুর্ভাগ্য হচ্ছে, এমন স্ত্রী পাওয়া, যাকে দেখামাত্রই অন্তরে বিতৃষ্ণ ভাবের উদয় হয়। তোমার বিরুদ্ধে তার কটুবাক্য উজিয়ে আসতে থাকে। তোমার আড়ালে তুমি স্বীয় ধন-সম্পদ এবং স্ত্রীর ব্যাপারে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকো।'*[১]

বাস্তবতা হলো, স্ত্রীর কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর জন্য দুর্ভোগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে যদি সৌন্দর্যের সাথে বদচলন ও মুখরা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর গায়ের চাপা রং স্বামীর সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়—সে আত্মগরিমা-হীন, মিষ্টভাষী, দ্বীনদার এবং উঁচু বংশীয় হওয়ার কারণে। মূলত এসব কারণেই নবী কারীম ﷺ পুণ্যবতী স্ত্রীর গুণাগুণ স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

অনেক যুবক শুধু সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ করে এমন কিছু জোরালো শর্ত আরোপ করে, যা কেবল অভিনেত্রী/মডেলদের মাঝেই পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আপনারা সৌন্দর্যের শর্ত আরোপ করবেন, এটা দোষের কিছু নয়; সুন্দরী পাত্রী খুঁজবেন, এটা নিন্দার কোনো বিষয় নয়; কিন্তু দ্বীনদারি এবং সৌন্দর্যের মাঝে যখন বৈপরীত্যের সৃষ্টি হবে (সৌন্দর্য আছে দ্বীনদারি নেই, কিংবা দ্বীনদারি আছে সৌন্দর্য নেই।) তখন কোনটাকে গ্রহণ করবেন? এটিই চিন্তার বিষয়।

এখনকার মানুষ চোখের হেফাজত করে না। বিভিন্ন ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায়, সিনেমায়, সিরিয়ালে, রাস্তাঘাটে নানাবিধ রঙচঙে জিনিস দেখে। ফলে স্বাভাবিক বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না। কারণ, দীর্ঘক্ষণ কৃত্রিম চাকচিক্যের মাঝে ডুবে থাকলে এবং চোখের হেফাজত না করলে কাছের স্বাভাবিক সৌন্দর্যতেও আর মন টেকে না। বিশেষ করে বর যখন পাত্রীকে দেখতে যায় বা বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়, মনে প্রবল আকার ধারণ করে এই অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা।

রাস্তাঘাটে, পেপার-পত্রিকায় নারীর সৌন্দর্যের দিকে অপলক চেয়ে থাকার ফলে

---

[১] মুসতাদরাকু হাকিম আলাস সহীহাইন, ২/১৭৫ [২৬৮৪]। ইমাম হাকিম সনদ সহীহ বললেও ইমাম যাহাবী কিছুটা আপত্তি করেছেন। তবে বর্ণনাটি সহীহ লিগাইরিহি। মাহমুদ আল-মিসরী তাঁর 'আয-যাওয়াজুল ইসলামিয়্যাস সাঈদ, ১৭৭'-এ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের চারটি করে বিবরণের উল্লেখ করলেও এই হাদীসে আসলে তিনটি করে রয়েছে। চারটির হাদীস সংক্ষিপ্ত এবং এসব বিবরণবিহীন। ইবনু হিব্বান, ৯/৩৪০ [৪০৩২]। সনদ সহীহ।

এবং নাটক-সিনেমা-সিরিয়ালের অভিনেত্রীদের কৃত্রিম চেহারা এইসব পুরুষের মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। ফলে তাদের মনে এই অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। বিবাহিত জীবনেও তারা শান্তি পায় না। মনের এই খুঁতখুঁতে অনুভূতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে কেবল ইসলাম। শরীয়তপ্রণেতা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ দৃষ্টি হেফাজতের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা যদি কেউ অনুসরণ করে, তাহলে বাস্তবেই সে নিজ স্ত্রীর প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ ও দাম্পত্য সুখের বেহেশতী অনুভবে ঋদ্ধ হবে।

যদি তুমি ফাতিমার মতো জীবনসঙ্গিনী পেতে চাও তাহলে আলীর মতো হতে চেষ্টা করো।

কিছু যুবক আসন্ন বৈবাহিক জীবন নিয়ে বিচলিত-বিব্রত। তাদের প্রশ্ন : এই চাকচিক্য, কৃত্রিমতা আর বেহায়াপনার যুগে পুণ্যবতী স্ত্রী কীভাবে পাবো? ধেয়ে আসা ফিতনার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপর্যয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً، أَوْ مَعَاذًا، فَلْيَعُذْ بِهِ

> *'শীঘ্রই অনেক ফিতনা দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে (উঁকি মেরেও) তাকাবে ফিতনা তাকে ঘিরে ধরবে। তখন কেউ যদি আশ্রয়ের কোনো জায়গা কিংবা নিরাপদ কোনো স্থান পায়, তাহলে সে যেন সেখানে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।'*[১]

আমাদের পূর্বসূরিদের একজন এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি তুমি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র মতো পুণ্যবতী স্ত্রী পেতে চাও, তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো পুণ্যবান হয়ে যাও।'

পাঠক, এত এত কৃত্রিমতার মাঝে, দ্বীনের খোলসে বদদ্বীনীর মাঝে প্রকৃত

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৭০৮১, অধ্যায় : ফিতনা; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৮৮৬

পুণ্যবতীর খোঁজ আপনার কাছে নেই, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে আছে। তাঁর খবরের বাইরে কিছু নেই, তিনি জানেন কে আপনার নয়ন জুড়াবে, আপনার নয়ন-জুড়ানো পুণ্যবতীর সন্ধানের কোনো অভাব নেই তাঁর কাছে। সুতরাং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ুন। নৈকট্যের স্তর অনুযায়ী তিনিই আপনার জন্য পুণ্যবতী স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেবেন; যে স্ত্রী দ্বীন-দুনিয়ার সকল কাজে আপনার সহযোগী হবে, যার উসীলায় আপনি আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাবেন আরও দ্রুত, আরও বেগবান হয়ে।

যুবকদের ক্ষেত্রে যেকথা বলা হলো, ঠিক একই নির্দেশনা যুবতীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

> *‘দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য। এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য। এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, সেগুলোর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে তাদের জন্য।’*[১]

তাই মানুষ যত বেশি নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে এগোবে, আল্লাহ্ তার প্রচেষ্টার মাত্রা অনুযায়ী তত বেশি পুণ্যবতী স্ত্রীর ব্যবস্থা তার জন্য করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ্। এজন্যই তো মানুষ যখন জান্নাতে আল্লাহর একদম চূড়ান্ত নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন তিনি তাদের জন্য মিলিয়ে দেবেন পরমা সুন্দরী, আয়তলোচনা ও সোহাগিনী অপ্সরীদের। সুবহানাল্লাহ্।

যুবকের মনস্কামনা–

---

[১] সূরা নূর, আয়াত-ক্রম : ২৬

এই তো কিছুদিন আগে কয়েকজন যুবকের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, তারা কেমন স্ত্রী চায়। তাদের স্ত্রীর ভেতর কী কী গুণ পেলে, তারা সন্তুষ্ট হবে। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে উত্তরও ভিন্ন ভিন্ন এসেছে। তাদের কেউ কেউ কিছু বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে নিয়েছে। আবার কেউ কেউ এখনও বাধ্যতামূলক হিসেবে নেয়নি। গুরুত্বপূর্ণ উত্তরগুলো আপনাদের সামনে পেশ করছি।

প্রথম জন : 'আমি চাই সতীসাধ্বী এমন একজন স্ত্রী, যে নিজেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে।'

দ্বিতীয় জন : 'আমি চাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, পাশাপাশি সে হতে হবে দুনিয়ার সকল বিষয়ে অগাধ অভিজ্ঞতাসম্পন্না।'

তৃতীয় জন : 'আমার স্ত্রী হতে হবে লাস্যময়ী গড়নের। স্বামী-সন্তানের প্রতি যত্নশীলা।'

চতুর্থ জন : 'আমার স্ত্রী হবে নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারী। অর্ধপ্রস্ফুটিত স্তনযুগল। যৌনাঙ্গে প্রচ্ছন্ন আহ্বান। ফর্সা ত্বকে রক্তনালি যেন দৃশ্যমান। কামকলা-পটিয়সী। এবং স্বর্ণকেশী।'

পঞ্চম জন : 'আমার স্ত্রী হবে সর্বগুণে গুণান্বিতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর। লাবণ্যময়ী, অঙ্গশোভায় অপরূপা। বিয়ের পর আমার চোখই যেন না সরে।'

তাদের মধ্য থেকে একজনই কেবল বলল : 'আমি দ্বীনদার স্ত্রী চাই। কারণ, নবী কারীম ﷺ বলেছেন— দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

এই ছিল আমার অনুসন্ধানে কজন যুবকের পছন্দ, তাদের চোখে 'মনের-মতো' স্ত্রীদের 'কনফিগারেশন'। এদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে, বলুন তো? নিশ্চয় শেষের জন। সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চায় না। রূপ সম্পদ বংশ—সব কিছুরই নেগেটিভ একটা দিক আছে। অধিক রূপ, অধিক সম্পদ, অধিক বনেদি—সংসার-জীবনকে বিষিয়েও তুলতে পারে। কিন্তু দ্বীন এমন এক বৈশিষ্ট্য যা যত বেশি হবে, ততই স্বামীর জন্য প্রশান্তিদায়ক। দুনিয়াতে এই স্ত্রীর কারণে যেমন সে প্রশান্ত থাকবে, তেমনি আখিরাতের চির-প্রশান্তির দিকেও এই স্ত্রী

তাকে ঠেলে দেবে। চালাক ছেলেটি তাই নবী কারীম ﷺ-এর নির্দেশকে সামনে রেখেছে—'দ্বীনদারিকে প্রাধান্য না দিলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।'

মঙ্গলগ্রহের মেয়ে

শাইখ আহমাদ আল-কাত্তান হাফিজাহুল্লাহ বলেন, 'আমাদের প্রথাগত সমাজব্যবস্থা এবং আবহমান ঐতিহ্য তালাকপ্রাপ্তা নারীকে চরম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আসছে। বিধবা, খানিকটা শ্যামবর্ণ কিংবা সমাজের ভাষায় কালো মেয়ের প্রতিও চিত্রটা একইরকম। সমাজ যেন তাদেরকে আজীবন আইবুড়ো হয়ে কুঁকড়ে থাকার দণ্ড দিয়ে বসে আছে। একেকজন তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, শ্যামলা কিংবা সমাজের ভাষায় কালো মেয়েগুলো যেন মস্ত অপরাধের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি। সমাজের গড়ে তোলা অদৃশ্য চৌদ্দ শিকের মাঝে পুরে রেখেও যাদের উপর চলে কড়া নজরদারি।

যেমন ধরুন—

বিবাহ-প্রত্যাশী কোনো ছেলে বলল, 'আমি একজন পুণ্যবতী মেয়েকে বিয়ে করব।'

তার বন্ধু বলল, 'তাহলে তুমি অমুক মেয়েকেই বিয়ে করো। সে খুব ভালো মেয়ে।'

বিবাহ-প্রত্যাশী ছেলে প্রত্যুত্তরে বলল, 'না না, কী বলো, তুমি! তাকে কেন বিয়ে করব? সে তো তালাকপ্রাপ্তা।'

বন্ধু খানিকটা জোরালো গলায় বলল, 'তবুও সে পুণ্যবতী মেয়ে। তার স্বামী ছিল বেনামাযী মদখোর। বহু চেষ্টা করেও তার বদ-খাসলতকে স্ত্রী শোধরাতে পারেনি। অবশেষে স্বামীর পরিশুদ্ধির আশা ছেড়ে দিয়ে অনন্যোপায় হয়ে তালাক নিয়ে নিয়েছে। এই হলো তার তালাকের কারণ। তার নিজের কমতি কীসে, বলো! একজন স্বামী তার স্ত্রীর মাঝে ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য এবং দ্বীনদারির যা যা আশা করে সবগুলোই তো রয়েছে তার মাঝে।'

ছেলেটি এবার তেতে উঠল, 'আমি কোনো তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা এবং পূর্বে-প্রেমের-সম্পর্ক-থাকা মেয়েকে বিয়ে করব না। যদি তাদের বিয়ে এবং তালাকের মাঝে মাত্র কয়েক সপ্তাহও অতিবাহিত হয়, তবুও না। আমি চাই

সতীসাধ্বী কুমারী মেয়ে। সে আমার সাথে রঙঢঙ করবে, আমি তাকে নিয়ে সুখের সাগরে ভাসব।'

কোমল কণ্ঠে বলল বন্ধুটি, 'বিয়ের উদ্দেশ্য কি শুধু রঙঢঙ করা? নবী কারীম ﷺ- এর হাদীসের উদ্দেশ্যে কি এই যে, সমাজে এমন কুপ্রথার প্রচলন ঘটবে? তাহলে তো বিনা দোষে, বিনা কারণে স্বামীহীনা থেকে যাবে শত-সহস্র মেয়ে।

'তুমি শোনোনি, জনৈক ব্যক্তি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল স্ত্রী হয় তালাকপ্রাপ্তা ছিলেন, নয়তো বিধবা।" বরং তিনি মক্কার প্রতিকূল পরিবেশে নবুওয়াতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা পাশে থাকার কারণে, যিনি ছিলেন একজন বিধবা। আজীবন তাঁর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করে গেছেন নবীজি। আচ্ছা বন্ধু, তুমি কেমন মেয়ে চাইছ বিয়ের জন্য, বলো?'

বিবাহ-প্রত্যাশী ছেলেটি গোমড়ামুখে বলল, '(সেগুলো শুনেই-বা কী লাভ!) আমার শর্তের ফিরিস্তি বেশ লম্বা। আমার স্ত্রী দেখতে পরমাসুন্দরী এবং দীর্ঘ-তনু হবে; হরিণ-শাবকের মতো চপল হবে, ময়ূরের মতো থাকবে তার চোখ-জুড়ানো গড়ন। নিশ্চুপ থাকবে, কিন্তু তাকালে মনে হবে যেন হাসছে। আর যদি হাসে, তাহলে মনে হবে যেন কাছে ডাকছে। কোকিলের মতো কিন্নরকণ্ঠ আর ফর্সা ত্বকের উজ্জ্বলতা ব্যাবিলনের জাদুকরদের মতো আমাকে মোহিত করে রাখবে।

'দূর থেকে দেখলে তাকে মনে হবে ফুলের মতো কমনীয়। কাছে গিয়ে দেখলে মনে হবে ফুলের পাপড়ির মতো পেলব-কোমল। অপ্সরার মতো ডাগর ডাগর আঁখি। (ছিপছিপে শরীরের দরুণ) সে বসে থাকলে মনে হবে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ালে মনে হবে কোথাও আরোহণ করে আছে। সে হতে হবে এমন যে—সে মূলত ছিল বিত্তশালী। পরবর্তীতে দারিদ্র্য তাঁকে পেয়ে বসেছে। বিত্তবানদের আত্মমর্যাদাবোধ আর দরিদ্রের লাঞ্ছনার অনুভূতি—দুটোই থাকবে তার।

'সে হবে সহিষ্ণু বিদূষী এবং প্রজ্ঞাবতী বাগ্মী। যার সৌন্দর্যে আমি প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করব। রেশমের মতো সোজা, মেঘের মতো ভরাট কেশবতী। রূপ যেন ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, রাতে এক-রকম দেখতে তো দিনে আরেক রকম। মানুষ তার থেকে শিখবে মমতা-শ্রদ্ধা-নম্রতা। প্রতিবেশীর প্রতি

সহানুভূতি। ছোটদেরকে স্নেহ। গুরুজনদের শ্রদ্ধা। আরও অনেক কিছু...!'

বন্ধুটি তটস্থ হয়ে বলল, 'রোসো রোসো বন্ধু, আর না। ব্যস, থামো এবার। আর বলতে হবে না। তুমি, দোস্ত, যে বিবরণ দিলে, এমন মেয়ে পাওয়ার জন্য রাজারা নিজের রাষ্ট্র বিকিয়ে দেবে। তারপরেও তার মূল্য চুকানো সম্ভব না। আরে মিয়া! তোমার আহামরি শর্তগুলোর লোভ সামলাও। পাত্রীপক্ষ তো তোমার মাঝে শুধু দ্বীনদারি আর বিশ্বস্ততা থাকাটাই শর্ত করেছে। বাড়িতে আয়না আছে? নিজের চেহারাটা দেখেছ কখনো? বাড়ি যাও। আয়নায় নিজের চেহারাখানা একটু দেখো। তুমি যেসব গুণের চাহিদাপত্র দিলে, এগুলোর একটিও যদি তুমি নিজের মাঝে পাও; তাহলে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাব মঙ্গলগ্রহের (কল্পরাজ্যের) মেয়ের কাছে।'[১]

দুই. সচ্চরিত্র

একাগ্রচিত্তে ও লাগাতার দ্বীনের কাজ করার জন্য স্ত্রী সচ্চরিত্রা হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। মুখরা, দুশ্চরিত্রা ও অকৃতজ্ঞ নারী পুরুষের মনকে সারাদিন অশান্ত করে রাখার জন্য যথেষ্ট । এটা তো জানা কথাই যে—

وَالصَّبْرُ عَلَى لِسَانِ النِّسَاءِ مِمَّا يُمْتَحَنُ بِهِ الأَوْلِيَاءُ

> *'মুখরা স্ত্রীর তির্যক জবান দ্বারা আল্লাহওয়ালাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়।'*[২]

তাহলে বুঝুন, এটা কতবড় পরীক্ষা!

তিন. সৌন্দর্য

সৌন্দর্যের ভক্ত সবাই। কে না চায়, আমার বউটা সুন্দরী হোক। স্ত্রীর সৌন্দর্য পরকীয়ার মতো কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার উসীলা হয়। এ কারণেই বিয়ের আগে পাত্রী দেখে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নবীজি ﷺ। কারণ হিসেবে বলেছেন, এতে পারস্পরিক পছন্দের দ্বারা ভালোবাসা প্রগাঢ় হয়।[৩] তবে কিছু

---

[১] শাইখ আহমাদ আল-কাত্তান, সিররি ওয়া লিননিসাই ফাকাত, পৃষ্ঠা-ক্রম : ৪৮-৫১

[২] ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ২/৩৮, পরিচ্ছেদ : বিবাহের আদব

[৩] মুগীরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈকা নারীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এ কথা জানতে পেরে রাসুল ﷺ বলেন—

انظرْ إليْها ، فإنَّهُ أحرَى أنْ يُؤدَمَ بينَكُما

আল্লাহর ওলী আছেন, যাঁরা পার্থিব কোনো সৌন্দর্যের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করেন না, এবং বিবাহের পেছনে দেহ ভোগ করাও তাদের উদ্দেশ্য থাকে না। তারা বিয়ে করেন আল্লাহর হুকুম ও নবীজির সুন্নত পুরা করার জন্য। যেমন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ সুস্থ-সবল মেয়েকে বিয়ে না করে বিয়ে করেছিলেন তাঁরই নিকটাত্মীয় এক অন্ধ নারীকে। তবে এমন ঘটনা বিরল।

যদি দ্বীনদারির সাথে অতিরিক্ত হিসেবে পাত্রী সুদর্শনা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এবং সম্পদশালী হয়, তাহলে সে কম-সুন্দরী দ্বীনদার মেয়ে থেকে উত্তম। অর্থাৎ, দ্বীনদারি যদি একই স্তরের হয়, তবে সুশ্রী নারী গড়পড়তা চেহারার মেয়ে থেকে উত্তম। আবার, দ্বীনদারি যদি একই স্তরের হয়, সম্ভ্রান্ত বংশীয় মেয়ে উত্তম অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশীয় মেয়ে থেকে। দ্বীনদারি থাকতে হবে আগে, এরপর যা যা অতিরিক্ত পাওয়া গেল তা বোনাস, আলহামদুলিল্লাহ।

চার. অভিজাত বংশের এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বাছাই করা

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে পছন্দ করে নেওয়ার জন্য ইসলামে সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে যে—'জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী যেন সম্ভ্রান্ত বংশের হয়। যে বংশের শিষ্টাচার, আতিথেয়তা ও ন্যায়পরায়ণতা লোকমুখে শোনা যায়। সমাজে তাদের মানসম্মান এবং বংশীয় গুণকীর্তনের কথা লোকমুখে জারি থাকে।' মানুষ হচ্ছে খনির মতো। তাদের মাঝে বংশগত পার্থক্য থাকবেই।[১]

'তাকে দেখে নাও, এটা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি করবে।' –তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১০৮৭, অধ্যায় : বিবাহ; সনদ হাসান।

[১] আরবের বংশপ্রথা আর উপমহাদেশের বংশপ্রথা সম্পূর্ণ আলাদা। উপমহাদেশের বংশপ্রথা মোটা দাগে পেশাভিত্তিক (হিন্দুসমাজে) এবং সামন্ত-সমাজে সম্পত্তিভিত্তিক (মুসলিম সমাজ)। চৌধুরী, তালুকদার, মজুমদার, সরদার, সরকার, ভুঁইয়া, দেওয়ান, কাজী, খন্দকার, মুনশী, শিকদার, জোয়ার্দার ইত্যাদি মুসলিম পদবী মূলত জমিদারির পরিমাণ, সরকারি চাকরি বা সেনাবাহিনীর পোস্ট ইত্যাদি। এগুলো আরবের বংশের মতো সম্ভ্রান্ততা নির্দেশক ও আভিজাত্যের নিশ্চায়ক নয়। আরবের বংশপ্রথা ভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গিফার গোত্রের পেশা ছিল বাণিজ্যিক কাফেলার পথ আটকে সম্পদের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়া (ছিনতাই/ চাঁদাবাজি)। আবার নবীজি ﷺ বংশ বনু হাশিম ছিল কা'বার সেবায়েত। কোনো বংশের দায়িত্ব ছিল হাজী-অতিথিদের পানি পান করানো। কোনো বংশ কাব্যচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। কোনো বংশ কা'বার চাবি রাখত। মানে এভাবে একটা বংশীয় দায়িত্ব, বংশীয় বৈশিষ্ট্যের বিশেষায়ণ ছিল। বংশের নাম কলংকিত করলে বংশ থেকে বের করে দেয়া হতো। দাদা-পরদাদার পেশার দ্বারা সম্ভ্রান্ততা নির্দিষ্ট হতো না আমাদের মতো। বরং দায়িত্ব-আদব-যোগ্যতা ইত্যাদির দ্বারা আভিজাত্য নির্ধারিত হতো। সুতরাং এখানে বংশ-কে আমাদের বংশ-ধারণা দিয়ে বুঝলে ভুল হবে। বিস্তারিত জানতে ড. আবদুল হান্নানের বাঙালি মুসলমানের পদবী বইটি এবং মার্টিন লিংগস-এর মহানবীর জীবন আলো বইটি দেখা যেতে পারে।

এমন পাত্রী বাছাই করা উচিত, যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছে এবং উত্তম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত পরিবার থেকে উঠে এসেছে, পাশাপাশি বদান্যতায় প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যক্তির ঔরসে যার জন্ম। এক্ষেত্রে রহস্য হলো 'ফ্যামিলি কালচার'। যেমন পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে মেয়েটি বেড়ে উঠেছে, আশা করা যায় তার মন-মানসিকতা-চিন্তাধারাও তেমনি গড়ে উঠেছে। যেমন বংশীগত আলিম পরিবারের মেয়ে, বা বংশের অনেকেই ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত, বা বংশে শিক্ষিত দীনদ্বার মানুষ বেশি। স্বাভাবিকভাবেই এমন মেয়ে পরিবারে ভদ্রতা ও ইসলামী মননশীলতার শিক্ষা পায়। তারা সচ্চরিত্রা ও আদর্শবতী মায়ের দুধ পান করে। দ্বীনদার দাদা-নানা-বাবা-চাচা-মামার কোলে বড় হয়। ফলে প্রগাঢ়ভাবে ধারণা করা যায়, মেয়েটিও ইসলামের চেতনার বাহক হবে।

উসমান ইবনু আবিস সাক্বাফী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলেদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদেরকে বউ করে আনার জন্য। এবং কুখ্যাত বংশের মেয়েদের থেকে দূরে থাকার ওসীয়ত করে গেছেন। ওসীয়তনামায় তিনি বলেছেন—

> 'হে আমার বিয়ের উপযুক্ত সন্তানেরা, কিছুদিন পরেই যারা ফসল ফলাবে (বংশবিস্তার করবে)। শোনো, প্রতিটি ব্যক্তির (ফসল ফলানোর আগে) দেখে নেওয়া দরকার সে কোথায় ফসল ফলাচ্ছে। অর্থাৎ সে কাকে বিয়ে করছে? দাগি বংশোদ্ভূত মানুষগুলো খুব কমই সম্ভ্রান্ত হয়। সুতরাং বিয়ের আগে যাচাই-বাছাই করো। যদিও এতে কিছু সময় ব্যয় হবে, তবুও ভালো।'[১]

সন্তানের জন্য আপনি কেমন মা নির্বাচন করলেন, এটা আপনার উপর অনাগত সন্তানের অধিকার। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁরই এক ছেলে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন, বাবার প্রতি সন্তানের অধিকার কী?' তিনি বলেছিলেন, **'সর্বপ্রথম অধিকার হলো, সন্তানের মাকে উত্তমভাবে নির্বাচন করে বিয়ে করা।** পরবর্তীতে সন্তানের ভালো একটি নাম রাখা। এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া।'[২]

---

[১] ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতিআব, ৩/৩৬, পরিচ্ছেদ : উসমান ইবনু আবিল আস [১৭৭২]

[২] আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান, তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম, ১/১২৭, ১২৮। তবে বর্ণনাটির

পাত্রী যাচাই-বাছাই কতটা জরুরি, পিতা-পুত্রের এই সংলাপ থেকে স্পষ্ট।

পাঁচ. স্বল্প দেনমোহরে বিয়ে সম্পন্ন করা

বিয়ের মাঝে কল্যাণের উৎস হচ্ছে স্বল্প দেনমোহর, এটা থেকেই বিয়ের বাকি সব কল্যাণ-বারাকাহ-প্রশান্তির ফল্গুধারা জারি হয়। নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

> *'স্বল্প খরচের (দেনমোহরের) বিবাহ সর্বোত্তম।'*[১]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী কারীম ﷺ চারশো দিরহামের বেশি দেনমোহর দিয়ে নিজেও বিয়ে করেননি এবং কোনো মেয়ের বিয়েও দেননি।'[২] যদি বিয়ের দেনমোহরের আধিক্য সম্মান লাভের কোনো কারণ হতো, তাহলে এ-কাজটি নবী কারীম ﷺ অবশ্যই করতেন। নবীজির বেশ কজন সাহাবী দেনমোহর হিসেবে এক-টুকরো স্বর্ণ দিয়ে বিয়ে করেছেন। যার মূল্য ছিল মাত্র পাঁচ দিরহাম।[৩]

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ দুই দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর রাতে মেয়েকে নিজে নিয়ে গিয়ে স্বামীর বাড়ি দিয়ে এসেছেন।[৪] নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

কোনো সনদ পাওয়া যায় না। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল মুকাদ্দাম তাঁর 'মাহউল উম্মিয়্যাতিত তারবাউইয়্যাহ, ১১/১৯'-এ এই বর্ণনাটিকে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ সংক্রান্ত কিছু দুর্বল হাদীস রয়েছে। সেগুলোতে পিতার বিবাহের সাথে সন্তানের অধিকার বিষয়ক কোনো তথ্য নেই। অবশ্যি বাণীগুলো বেশ প্রসিদ্ধ। সাহাবীর বক্তব্যের সনদ না থাকলে স্বাভাবিক যুক্তিতে এসব বক্তব্যের যৌক্তিক বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২১১৭, অধ্যায় : বিবাহ; সনদ সহীহ।

[২] ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন : ২/৪০, পরিচ্ছেদ : বিবাহের আদব। আল্লামা ইবনুল ইরাকী ইমাম তিরমিযীর উদ্ধৃতি দিয়ে এর সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ১২ উকিয়া তথা প্রায় ৫০০ দিরহামেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। মুসনাদু আবি দাউদ তয়ালিসী : ১/৬৪ [৬৪]। সনদ সহীহ। ইমাম তহাবী, শরহু মুশকিলিল আসার : ১৩/৪৮ [৫০৪৫]। সনদ সহীহ লিগাইরিহি।

[৩] ইমাম খাত্তাবী, আ'লামুল হাদীস (সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) : ২/৯১৫, অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মোহরানায় বিয়ে করেছেন। ইমাম বাগাবী, শরহুস সুন্নাহ : ৯/১৩৪

[৪] সুনানু সাঈদ ইবনি মানসূর : ১/২০০ [৬২০]

> *'সৌভাগ্যবান মেয়ে সে, যার পাণিপ্রার্থী কম হয়, বিয়ের দেনমোহর হয় স্বল্প পরিমাণের এবং আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাও সীমিত।'*[১]

ছয়. ভিন্ন গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করা

পাত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দ্বীন-ইসলামের আরও একটি নির্দেশনা হচ্ছে, নিজ আত্মীয়-স্বজন এবং স্ববংশীয় মেয়েদের বিয়ে না করে ভিন্ন গোত্রীয় মেয়েদেরকে বিয়ে করা। এতে মুসলিমদের মাঝে সামাজিক বন্ধন জোরালো হয়। বংশে বংশে আত্মীয়তা বাড়ে। পারিবারিক পরিচিতির ছক প্রশস্ত হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি ও বিপদাপদ থেকে সন্তান হেফাজতে থাকে। প্রজন্মের দৈহিক গঠন-সহ অন্যান্য যোগ্যতায় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করে।

সায়িব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পরিবারের প্রতি লক্ষ করে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'তোমরা দুর্বল হয়ে পড়েছ। তাই প্রতিভাসম্পন্ন বংশে (অর্থাৎ অন্য বংশে এবং প্রবাসীদেরকে) বিয়ে করো।' তিনি এও বলেছেন, 'নিজ আত্মীয়-স্বজনদের বিয়ে করো না। কারণ, এক্ষেত্রে দুর্বল সন্তানের জন্ম হয়।'[২]

ক্লিনিক্যাল জেনেটিক্স-এর ভাষায়, মা-বাবার চাচাতো-ফুফাতো-মামাতো-খালাতো ভাই-বোনের ছেলে-মেয়েদের বিয়েকে (second cousin) বলা হয় consanguineous marriage. এর ভেতরে আপন চাচাতো-ফুফাতো-মামাতো-খালাতো ভাইবোনের (first cousin) বিয়েও পড়ে। মানে ফার্স্ট ও সেকেণ্ড কাজিনের সাথে বিয়েকে Consanguineous marriage বা 'নিকটাত্মীয়ের মাঝে বিয়ে' বলা হয়। কিছু বিশেষ জন্মগত অসুখ আছে (autosomal recessive disorders), যেগুলো এমন বাবা-মায়ের সন্তানদের হতে পারে। যেমন[৩]—

- ☑ Sickle cell disease
- ☑ Cystic fibrosis (CF)
- ☑ Tay-Sachs disease

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ২৩৯৫৭, ২৪০৮৬; শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ হাসান।

[২] আল-মুগনী আন হামলিল আসফার লিলইরাকি : ২/৪২

[৩] TABLE of GENETIC DISORDERS, Medical Study Guides.University of Kansas Medical School.

- Gaucher disease
- Fanconi Anemia
- Hartnup's Disease
- Kartagener's Syndrome
- Pyruvate Dehydrogenase Deficiency
- Xeroderma Pigmentosum
- Congenital Fructose Intolerance
- Galactosemia
- Glycogen Storage Disease Type I II III V)
- Ataxia-Telangiectasia
- Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
- Niemann-Pick Lipidosis
- Albinism
- Alkaptonuria
- Homocystinuria
- Maple Syrup Urine Disease
- Phenylketonuria (PKU)
- Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease (ARPKD)

তবে এই রিস্কের পরিমাণ কেমন? যেমন ফার্স্ট কাজিন বিয়ের ক্ষেত্রে এসব অসুখের রিস্ক ১.৭% থেকে ২.৮% বেশি। মানে খুব বেশি না। আবার জন্মত্রুটির কোনো রিস্কই নাই, এমনও রিসার্চ এসেছে। মৃত শিশু জন্মের সম্ভাবনা ১.৭ গুণ বেশি। শিশুমৃত্যু স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১% বেশি।[১] মূলত এর কারণ হলো একই পূর্বপুরুষে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তা জিনের মাধ্যমে মা-বাবা দুজনের কাছ থেকেই পেয়ে এই শিশুতে আবার শক্তিশালী হয়ে যায়, যেহেতু দাদা-নানা লেভেলে বা বাপ-মা'র দাদা-নানা লেভেলে গিয়ে জিন সেই একজনেরই। আরেক রিসার্চে এসেছে, সেকেন্ড কাজিনে যে রিস্ক, আর অনাত্মীয়দের বিয়েতে যে রিস্ক, তা একই রিস্ক, পার্থক্য নেই।[২]

---

[১] Hamamy H. (2012). Consanguineous marriages : Preconception consultation in primary health care settings. Journal of community genetics, 3(3). 185–192

[২] Zlotogora, Joël, and Stavit A Shalev. "The consequences of consanguinity on the rates of malformations and major medical conditions at birth and in early child-

তবে উচ্চরক্তচাপ, সিজোফ্রেনিয়া, হৃদরোগ, ডায়বেটিস, অটিজম, ক্যান্সার—এসব অসুখের সাথে পারিবারিক ইতিহাসের একটা সম্পর্ক আছে। ফলে নিকটাত্মীয়-বিয়ের সাথে এগুলোরও একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, যদিও এমন স্পষ্ট রিসার্চ এখনও অপ্রতুল।

সাত. কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীন-ইসলামের আরও একটি নির্দেশনা হচ্ছে, অকুমারী মেয়েকে বিয়ে না করে কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা। এর প্রভূত তাৎপর্য এবং অগাধ উপকারিতা রয়েছে।

কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার উপকারিতা

একজন কুমারী মেয়ের হৃদয়জুড়ে প্রেম-আবেগ-পতিভক্তি সৃষ্টিগতভাবেই থাকে। জীবনে পদার্পণকারী প্রথম পুরুষকে সে শরীর-মন উজাড় করে ভালবাসতে চায়, হৃদয়ে স্বপ্ন-অভিমান-খুনসুটির বাগান সাজায় স্বামীকে ঘিরে। ফলে পারিবারিক মনোমালিন্য ও দাম্পত্যকলহ কম হয়। ভালোবাসার উষ্ণতা থাকে আকাশচুম্বী। ওদিকে কুমারীর চপলতা, লজ্জানম্র চাহনি, লাজুক পদচারণা, কপট রাগ, গালফোলা-অভিমান স্বামীকেও প্রবল আকর্ষণ, গভীর প্রেম ও অনাবিল মায়ার বাঁধনে বেঁধে দেয়। দুনিয়ার বুকে যেন একটুকরো বেহেশতে পরিণত হয় সংসারটি।

পক্ষান্তরে অকুমারী মেয়ের ব্যাপারটা ভিন্ন। অকুমারীরা আবেগপ্রবণ হওয়ার চেয়ে বাস্তববাদী হয় বেশি। তার প্রেমে-আবেগে প্রথম স্বামীর মতো সেই উজাড় করে দেওয়াটা আর থাকে না। দ্বিতীয় স্বামীর প্রতি তার আচরণ ও ভালোবাসা থাকে পরিণত, আগের সেই কিশোরীসুলভ সরলতা-চপলতা হারিয়ে যায়। পরস্পরের মন দেওয়া-নেওয়ার চেয়ে পারস্পরিক বাহ্যিক নির্ভরতা সেখানে মুখ্য। একই কারণে, প্রথম স্বামীর মতো ভালোবাসার টানও দ্বিতীয় স্বামী অনুভব করে না। হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসার সম্পর্কটা প্রথমবারের মতো হয়ে ওঠে না। নানা বিষয়ে আগের স্বামীর সাথে তুলনা চলে আসে। সম্পর্কে তিক্ততার বহু

---

hood in inbred populations." American journal of medical genetics. Part A vol. 152A,8 (2010): 2023-8.

সুযোগ তৈরি হয়। তবে ইসলাম তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীর প্রতিও সুবিচার, সদাচার এবং দ্বিতীয় বিয়ের ব্যবস্থা করার বিধান দিয়েছে। এখানে আমরা একজন কুমারের জন্য বিয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কুমারী পাত্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছি।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী কারীম ﷺ-এর সামনে একটি উপমার দ্বারা বিষয়টির বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন—

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا

> *'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, ধরুন, আপনি একটি উপত্যকায় গিয়েছেন। সেখানে কিছু ঘাস খাওয়া আছে। আর কিছু ঘাস এখনও খাওয়া হয়নি। তাহলে আপনি আপনার উটটি কোন ঘাসগুলোতে চড়াবেন?"*
> *'নবী কারীম ﷺ বললেন, "যে ঘাসগুলোতে এখনও উট চড়ানো হয়নি।"'*
> *অর্থাৎ আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, রাসুল ﷺ তিনি ব্যতীত অন্য কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি।*[১]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু নুআইম আসফাহানী বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আমি সেই বৃক্ষলতা (কুমারী নারী)।' [২]

নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

تَزَوَّجُوا بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

> *'তোমরা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ, তারা মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং অল্পে তুষ্ট হয়।'*[৩]

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫০৭৭, অধ্যায় : বিবাহ

[২] মারিফাতুস সাহাবাহ : ৬/২১০ [৭৩৮৩]

[৩] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৮৬১, অধ্যায় : বিবাহ। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে এর সনদ যঈফ (দুর্বল)। অবশ্য সমার্থক বর্ণনা থাকায় হাদীসটি হাসান গরীব। তবে মূল হাদীসে 'تَزَوَّجُوا'-এর পরিবর্তে

তিনি আরও বলেন—

عَلَيْكُمْ بِشَوَابِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهاً وَأَنْتَقُ أَرْحَاماً وَأَسْخَنُ أَقْبَالاً

> *'তোমরা যুবতী মেয়েদেরকে বিয়ে করো। কারণ, তারা মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং উষ্ণযৌবনে টইটুম্বুর।'*[১]

আরেক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

> *'তোমরা কুমারী মেয়েকে বিয়ে করো। কারণ, তারা মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম, উষ্ণযৌবনের অধিকারিণী এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে।'*[২]

এই বিষয়ের দিকে আলোকপাত করেই নবী কারীম ﷺ জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'কুমারী স্ত্রী হৃদয়ের গহীনে অগাধ ভালোবাসার সঞ্চার ঘটায়। নিজ সতিত্ব রক্ষা করে এবং অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের শক্তি জোগায়।' বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবী কারীম ﷺ জাতুর-রিকা যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, 'জাবির, কী খবর তোমার? বিয়ে করেছ?'

জাবির বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! বিয়ে করেছি।' নবীজি জানতে চাইলেন, 'কুমারী না অকুমারী?'

জাবির বললেন, 'না। অকুমারীকেই বিয়ে করেছি।' তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কুমারী হলেই তো ভালো হতো। সে তোমার সাথে খুনসুটি করত, তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।'

জাবির বললেন, 'আমার বাবা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমার সাত বোন বাড়িতে আছে। তাই আমি সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ মেয়েকেই বিয়ে করেছি। যেন সে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সকলকে আগলে রাখতে পারে। এবং তাদের

'عَلَيْكُمْ' রয়েছে। এতে অবশ্য অনুবাদ বা মর্মার্থে সমস্যা নেই।

[১] জালালুদ্দীন সুয়ুতী, আল জামিউস সগীর, হাদীস-ক্রম : ৭৫২৭; আবু নুআইম, আত-তিব্বুন নাবওয়াই, ২/৪৭১ [৪৪৮]। ইমাম সানআনীর মতে সনদ সহীহ। আত-তানওয়ীর : ৭/৩১৭ [৫৫৫১]

[২] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৮৬১

যথোচিত দেখাশোনা করতে পারে।'

নবীজি ﷺ তখন প্রশান্ত হৃদয়ে বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় তাহলে তুমি যথোপযুক্ত কাজটিই করেছ।'[১]

কুমারীকে বিয়ে করা উত্তম নাকি অকুমারীকে

অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, 'কাকে বিয়ে করা ভালো? কুমারীকে নাকি অকুমারীকে?' এই প্রশ্নের উত্তর আসলে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। আল্লাহ তাআলা আমাদের আম্মাজান নবীপত্নীদেরকে সতর্ক করে বলেন—

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ
قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

> *'যদি নবী তোমাদের সকলকেই পরিত্যাগ করেন তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী। যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারী, ইবাদাতগোজার, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।'*[২]

এই আয়াত সম্পর্কে যে ব্যাখ্যাগুলো এসেছে, সেগুলো একটু লক্ষ করি—

হাফিয ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে (তাফসীরু ইবনি কাসীর ৪/৩৭৬) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা হবে কুমারী ও অকুমারী।" আল্লাহ তাআলার এই কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাদের মধ্যে কেউ হবে কুমারী আর কেউ হবে অকুমারী। এটি শুধুমাত্র হৃদয়ের প্রভূত তৃপ্তির জন্য। কারণ, শ্রেণির ভিন্নতা অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "কুমারী এবং অকুমারী।"'[৩]

মৌরতানিয়ার শানকীতি ধারার প্রখ্যাত মালিকী মুফাসসির মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকীতি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়াতের মাঝে স্ত্রী নির্বাচনের স্বাধীনতা

---

[১] বর্ণনাটি দুটি হাদীসের সমন্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫০৭৯, অধ্যায় : বিবাহ; বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৩৬৭; অধ্যায় : ভরণপোষণ। মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৭১৫, অধ্যায় : মাতৃদুগ্ধ পান

[২] সূরা তাহরীম আয়াত-ক্রম : ৫

[৩] তাফসীরু ইবনি কাসীর : ৮/১৮৮

দেওয়ার ক্ষেত্রে অকুমারী নারীকে আগে উল্লেখ করাটাই তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। অথচ হাদীসে নবী কারীম ﷺ জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, "তুমি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করোনি কেন? সে তোমার সাথে খুনসুটি করত, তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।" এবং সূরা আর-রহমানের এক আয়াতে (৫৬) জান্নাতী হুরদের বৈশিষ্ট্যের মাঝেও আমরা পাই যে, তাদের সাথে কেবল ঐ জান্নাতী স্বামী ছাড়া ইতিপূর্বে কেউ মিলিত হয়নি। অনাঘ্রাত তাদের কুমারিত্ব। এক্ষেত্রে আবার স্ত্রী হিসেবে কুমারী নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

'অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন শ্রেণি-ভিন্নতার কথা বলে। এগুলো দ্বারা (কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে) শুধুমাত্র শ্রেণি-ভিন্নতা বুঝানো হয়েছে। আবার তাঁরা এটাও বলেছেন, "(আয়াত এবং হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) পৃথিবীতে অকুমারী এবং জান্নাতে কুমারী। যেমন ইমরান-তনয়া মারইয়াম (পৃথিবীতে অকুমারী ছিলেন, জান্নাতে কুমারী থাকবেন)।" এই আলোচনা থেকে যে বিষয়টা স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো—আল্লাহ তাআলা নবী কারীম ﷺ-এর পক্ষ নিয়ে তাঁর স্ত্রীদেরকে সতর্ক করেছেন। এবং দ্বীনদারি ও শিষ্টাচারিতাকে উপলক্ষ করে শ্রেষ্ঠ নারীদের অনিন্দ্য গুণাবলির কথা উল্লেখ করেছেন। অকুমারী নারীদের বংশীয় মর্যাদা ও নিরুপম শিষ্টাচারিতার প্রতি লক্ষ করে তাঁদেরকে শুরুতে উল্লেখ করেছেন।' [১]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে নবীজির কথোপকথন খেয়াল করুন। অকুমারী বিয়ে করার পেছনে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু কারণ দেখালেন : 'আমার বাবা আবদুল্লাহ উহুদ-যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আমার বাড়িতে অনেকগুলো বোন আছে। আমি বোনগুলোর মতোই (সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ) কাউকে বিয়ে করতে বিব্রতবোধ করেছি। তাই আমি এমন একজনকে বিয়ে করেছি যে তাদেরকে আগলে রাখতে পারবে। এবং তাদের যথোচিত দেখাশোনা করতে পারবে।'

নবী কারীম ﷺ প্রশংস-চিত্তে বললেন : 'আল্লাহ তোমার সংসারে বরকত দান

---

[১] আযওয়াউল বায়ান ফী ঈযাহিল কুরআনি বিল কুরআন : ৮/২২২; সূরা তাহরীম আয়াত-ক্রম : ৫-এর ব্যখ্যায়। মাহমুদ আল-মিসরী এই বক্তব্যটি আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালীমের নামে উদ্ধৃত করলেও মূলত তা সঠিক নয়। তিনি তাঁর শাইখ আল-আমীন শানকীতি রাহিমাহুল্লাহ'র তাফসীরের উপসংহারে শাইখেরই এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

করুন।' বা তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ তোমার সংসারে কল্যাণ দান করুন।' আর আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত নবী কারীম ﷺ-এর বাদবাকি সকল স্ত্রীই অকুমারী ছিলেন। এই দুটো বিষয় থেকে আঁচ করা যায়, অকুমারীর সাংসারিক অভিজ্ঞতার একটি অপরিসীম মূল্য ও প্রভাব রয়েছে পুরুষের জীবনে।

কাকে বিয়ে করা উত্তম, কুমারীকে না কি অকুমারীকে? এই প্রেক্ষাপটের সারাংশ–

উল্লিখিত আলোচনার আলোকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুমারী নারীকে বিয়ে করাই সর্বোত্তম। কারণ, নবী কারীম ﷺ জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, 'তুমি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করোনি কেন? সে তোমার সাথে খুনসুটি করত, তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।' এখানে নবী কারীম ﷺ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করতে উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

আবার কিছু বিষয় আমাদের সামনে উঠে আসে যাতে বোঝা যায় যে, অবস্থাভেদে অকুমারী মেয়েকেই বিয়ে করা উত্তম হয়ে যায়। যেমন জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র অকুমারী নারীকে বিয়ে করার কারণ।

তাছাড়া অকুমারী নারীরা হয় নিরাশ্রয়, বাপ-ভাইয়ের উপর এক ধরনের বোঝা। তারা নতুন স্বামীর কাছে নিজের ঠিকানা খুঁজে পায়। আর এই নিরাশ্রয় নারীকে আশ্রয়-খোরপোষ দিয়ে স্বামীও হয় নেকীর ভাগী।

আরও একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। বিয়ের মাধ্যমে অকুমারী নারীর বৈধব্য ও একাকিত্বের যন্ত্রণা দূর করা যায়, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা দেয়া যায়। যেমনটা ঘটেছিল নবী কারীম ﷺ কর্তৃক আম্মাজান উম্মু সালামাহ, উম্মু হাবীবা, জুওয়াইরিয়া ও সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহুন্নাকে বিবাহের দ্বারা।

আরও একটি বিষয়, অকুমারী নারী অধিকাংশ সময় দ্বীনদারির দিক থেকে পরিপক্ব হয়। কিশোরীর উদাসীনতা, বালখিল্য ও চপলতা তার মাঝে থাকে না। ফলে বেশি আখিরাতমুখী ও আমলদার হয়, যা স্বামীর জন্যও চিন্তামুক্তি ও দ্বীনী খোরাক যোগায়। এই স্ত্রী অধিক কল্যাণের কারণ হয় দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, বিবাহ-প্রত্যাশী পুরুষটি এমন একটি শ্বশুরালয়ের স্বপ্ন দেখে যাদের মাঝে মজবুত দ্বীনদারি রয়েছে। কিংবা এমন

দ্বীনী ঐতিহ্য ও খ্যাতি রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান করে দেবেন। ক্ষেত্রবিশেষ এমন পরিবারের তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা নারী অন্য পরিবারের কুমারী নারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। বরং দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিলে তাই উত্তম হবে।

আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত নবী কারীম ﷺ-এর একটি হাদীস, যার বিস্তারিত আলোচনা সামনেই আসছে, হাদীসটিতে তিনি বলেন—

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ،

> *‘যে ব্যক্তি তার দাসীকে সর্বোত্তম জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং শিষ্টাচারিতা শিখিয়ে আদর্শবান করে গড়ে তোলে, তারপর তাকে আযাদ করে নিজেই বিয়ে করে নেয়, সে দুটো প্রতিদান পাবে।’*

বিবাহের ক্ষেত্রে একজন দাসী স্বাধীনতা লাভের আগপর্যন্ত কখনোই স্বাধীন মুমিন নারীর (কুমারী কিংবা অকুমারীর) সমতুল্য হতে পারে না। অথচ হাদীসে দাসীকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে বিয়ে করলে দ্বিগুণ সাওয়াবের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে তো স্বাধীন অকুমারী (তালাকপ্রাপ্তা) কিংবা বিধবা নারীকে বিয়ে করলে আরো উত্তম বিনিময় পাওয়ার কথা।

মূল কথা হলো, সাধারণ বিবেচনায় একজন পুরুষের জন্য কুমারী নারীই সর্বোত্তম। তবে বিশেষ বিবেচনায় অকুমারী তালাকপ্রাপ্তা কিংবা বিধবা নারীকে বিয়ে করার সামাজিক, পার্থিব ও পরকালীন বিভিন্ন উপকারিতাও রয়েছে।

আট. অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করা

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীন-ইসলামের আরও একটি নির্দেশনা হচ্ছে, অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বাছাই করা। কীভাবে বুঝবেন? দুটি বিষয়ের মাধ্যমে এটি বোঝা যাবে।

প্রথমত, গর্ভবতী হতে বিঘ্ন ঘটায় বা অনুর্বর করে ফেলে, এমন রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ মেয়ে দেখতে হবে। শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে অবগত হওয়ার জন্য চিকিৎসকদের দ্বারস্থ হতে হবে।

বন্ধ্যাত্ব নানান কারণেই হতে পারে। এর মধ্যে আছে—কিছু ওষুধ, বংশগত, লাইফস্টাইল, কিছু অসুখ। আমরা মোটাদাগে কিছু কারণ দেখে নিই চলুন—[১]

নারীর বন্ধ্যাত্ব

১. অ-স্থানে জরায়ু টিস্যু (Endometriosis)

জরায়ুর ভেতরে যে ধরনের কোষগুচ্ছ থাকে, এই রোগে জরায়ুর বাইরেও নানান জায়গায় এই কোষগুচ্ছ থাকে। মাসিকে খুব ব্যথা হয়। মাসিকের সময় জরায়ুর অংশগুলো যোনিপথে বেরিয়ে এলেও, এই বেজায়গার অংশগুলো বের হতে পারে না, যা জরায়ুনালি (fallopian tubes) ব্লক করে ফেলে, ডিম্বাশয়কে আচ্ছাদিত করে। এই সমস্যা অবশ্য (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) অপারেশন করে ঠিক করা যায়, ওষুধ খেয়ে সন্তানধারণের ক্ষমতা ঠিক হয় না। ২৫-৫০% বন্ধ্যা নারীর এই সমস্যা থাকে, আবার এই সমস্যা যাদের থাকে তাদের ৩০-৪০%ই বন্ধ্যা হয়।[২]

২. প্রজনন-নালিতে ইনফেকশন (Reproductive tract infections)

মূলত পুরুষের যৌনবাহিত রোগ (STDs) এবং মেয়েদের chlamydia-ঘটিত ইনফেকশনে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

৩. পেলভিক প্রদাহ (Pelvic inflammatory disease, PID) :

নারীদের 'উপরদিককার প্রজনন অঙ্গের' ইনফেকশন। জরায়ু, জরায়ুনালি, ডিম্বাশয়—এসবে ইনফেকশন থাকলে ক্রমান্বয়ে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। একদফা PID হলে বন্ধ্যাত্বের রিস্ক বেড়ে যায় প্রায় ১৫%। তিন বা তার বেশি PID হলে প্রায় ৫০% রিস্ক বেড়ে যায় বন্ধ্যা হবার।

৪. নারী হরমোনে ভারসাম্যহীনতা

অনিয়মিত মাসিক থেকে শুরু করে নানান লক্ষণ হতে পারে। অবশ্য ওষুধ সেবনেই এসব ঠিক হয়ে যায়। থাইরয়েড হরমোনে সমস্যা থাকলেও ডিম্বপাত সমস্যার দরুন বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে।

---

[১] Conditions that affect fertility [www.health.harvard.edu]

[২] What are some possible causes of female infertility? US National Institutes of Health.

৫. পলিসিস্টিক ওভারি : ডিম্বাশয়ে প্রচুর সিস্ট (তরলপূর্ণ গোটা) থাকে।

৬. জরায়ু টিউমর : সবচেয়ে কমন হল 'ফাইব্রয়েড'। এর ফলে অটোমেটিক গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে।

৭. পলিপ : জরায়ুর ভেতর আঙুলের মত অনেক কুঁড়ি থাকে। অপারেশন করে ফেললে ঠিক হয়ে যায়।

৮. আত্মবিধ্বংসী রোগ : লুপাস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, হাশিমোতো থাইরোয়েড প্রদাহ—

এসব রোগে আমাদের রোগ-প্রতিরোধব্যবস্থা আমাদের দেহেরই নানান কোষের বিরুদ্ধে কাজ করে। এসব রোগেও বন্ধ্যাত্ব হয়।

৯. দিনে পাঁচ কাপ কফি, এলকোহল, মাদক ও ধূমপান।

পুরুষের বন্ধ্যাত্বের কারণ

১. ধূমপান

২. এলকোহল-আসক্তি

৩. মোটা শরীর

৪. বিষাক্ত বস্তু ব্যবহারকারী (কীটনাশক, আগাছানাশক, শিল্পকারখানায় কেমিক্যাল)

৫. ভেরিকোসিল: অণ্ডকোষের শিরা মোটা হয়ে যাওয়া

৬. একশিরা : অণ্ডথলিতে অণ্ডকোষ না নামা

৭. কম টেস্টোস্টেরন হরমোন

যেসব ওষুধ বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনে[১]

- ☑ ক্যান্সার কেমো বা রেডিওথেরাপি
- ☑ আর্থ্রাইটিসের Sulfasalazine
- ☑ উচ্চরক্তচাপে calcium channel blockers

[১] Everything You Need to Know About Infertility [www.healthline.com]

- ☑ ডিপ্রেশনের ওষুধ (tricyclic antidepressants)
- ☑ স্টেরয়েড
- ☑ মারিজুয়ানা

মেয়েদের রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে—

নারীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে আর গর্ভস্থিত বাচ্চার গ্রুপ পজিটিভ হলে প্রথম বাচ্চার কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় বাচ্চার গ্রুপও পজিটিভ হলে, সেই বাচ্চাটির সমস্যা হয়। রক্তকোষ ধ্বংস হয়ে প্রচুর জন্ডিস হয়, বাচ্চা মারাও যেতে পারে। এজন্য আগে সমস্যা হতো, এখন নেগেটিভ মায়ের প্রথম বাচ্চার সময়ই বাচ্চার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে ৭২ ঘণ্টার ভেতর একটা ইনজেকশন দিয়ে দিলে পরের বারও আর সমস্যা হয় না।

পাত্রীর সন্তান জন্মদান ক্ষমতা বোঝার জন্য দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হলো, মেয়ের মা-খালা-ফুফু এবং তার বিবাহিতা বোনদের অবস্থা জানা। যদি তাঁরা সকলেই অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন, তাহলে পাত্রীও তাদের মতো হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

ডাক্তারদের অভিমত হলো, অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীদের স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্য ভাল হয়, দেহ থাকে রোগমুক্ত ও সবল। বাহ্যিকভাবে যার মাঝে এই গুণগুলো থাকবে সে পরিবারের কাজকর্ম, সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব ও দাম্পত্যজীবনের অধিকার সম্পাদনে তৎপরতার পরিচয় দেবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, যারা অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করতে চায় এবং সম্ভ্রান্ত স্বভাবচরিত্রের অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন সন্তান-সন্ততির লালনপালন, ভরণপোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার পেছনে যথেষ্ট খরচের সামর্থ্য, চেষ্টা ও ইচ্ছা রাখে। নয়তো তার অলসতা এবং চেষ্টার ত্রুটির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। নবী কারীম ﷺ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন—

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

> *'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সে কী ঠিকমতো দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে, নাকি কোনো হেরফের করেছে। এমনকি প্রত্যেককে তার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে (তাদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ কেমন ছিলো?)।'[১]*

বিবাহ-ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করার জন্য সর্বোচ্চ খোঁজখবর করে। কেন? যাতে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুখ উজ্জ্বল হয়। সকল উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিজগতের কল্যাণরূপে, তাদের সংখ্যাধিক্য এই উম্মতের নবীকে আনন্দিত করবে। সাহাবীগণ তাঁকে খুশি করার জন্য কতকিছু করেছেন, অভাগা আমরা সে সুযোগ পাইনি। কিন্তু এই একটি সুযোগ আমাদের রয়েছে আমাদের নবীজিকে খুশি করার।

জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি সম্ভ্রান্ত বংশীয় বিত্তশালী এক মেয়েকে ভালোবাসি। কিন্তু সে সন্তান ধারণ করতে পারে না। আমি কী তাকে বিয়ে করতে পারব?' নবী কারীম ﷺ তাঁকে সেই বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলেন। সেই ব্যক্তি পরবর্তীতে আবার এসে একই আবেদন পেশ করলেন। নবী কারীম ﷺ তাঁকে আগের মতোই নিষেধ করে দিলেন। তৃতীয়বার যখন তিনি আবার এলেন, তখন নবী কারীম ﷺ বললেন—

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

> *'তোমরা স্বামী-সোহাগিনী এবং অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিয়ে করো। কারণ, আমি তোমাদের সংখ্যা নিয়ে (হাশরের মাঠে) অন্যান্য জাতির কাছে গর্ব করব।'[২]*

এখানে দেখুন, স্বামী-সোহাগ এবং অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার মাঝে জোরালো সম্পর্ক আছে। কারণ, পুরুষ-মানুষ অনেক সময় তার স্ত্রীকে ভালোবাসে সন্তানাদির কারণে। আবার কখনও সন্তানদেরকে তাদের মায়ের কারণে ভালোবাসে। আর

[১] ইবনু হিব্বান : ১০/৩৪৫ [৪৪৯৩]; নাসায়ী, সুনানুল কুবরা : ৮/২৬৭ [৯১২৯]। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে ইবনু হিব্বানের সনদটি মুরসাল সহীহ।

[২] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২০৫০, অধ্যায় : বিবাহ। নাসায়ী, হাদীস-ক্রম : ৩২২৭। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে হাদীসটির সনদ শক্তিশালী, সহীহ লিগাইরিহি।

সর্বজনস্বীকৃত কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কটা আরও জমাট ও সুদৃঢ় হয়, আল্লাহ তাআলা যখন তাদের মাঝে ফুটফুটে সন্তানের আবির্ভাব ঘটান।

নয়. স্ত্রী মমতাময়ী ও সহানুভূতিশীল হওয়া

সব পুরুষই চায় স্ত্রী মমতাময়ী ও সহানুভূতিশীল হোক। কুরাইশ বংশের মেয়েদের এই গুণ সবচেয়ে বেশি। নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ

> *'উষ্ট্রারোহী নারীদের মধ্যে কুরাইশদের পুণ্যবতী মহিলারাই সর্বোত্তম। তারা শিশু-সন্তানের প্রতি অত্যধিক মমতাময়ী। এবং স্বামীর বিষয়-আশয়ের বেশি হেফাজতকারী।'*[১]

মেয়েরা স্বভাবতই আপনজনের প্রতি মমতাময়ী হয়। তবে কিছু পারিপার্শ্বিক বিষয় অনুভূতি, মায়া, যত্নআত্তি ইত্যাদির প্রকাশকে প্রভাবিত করে। যেমন যে মেয়ে ছোটবেলায় মায়ের আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত, যারা আত্মীয়-স্বজনের সাথে ওঠাবসা কম করে (প্রবাসজীবন বা অন্য কারণে) তাদের মায়া-মমতার প্রকাশ কিছুটা চাপা হয়। যেহেতু ভালোবাসার প্রকাশ কীভাবে করতে হয়, সেটার সাথে তাদের পরিচিতি কম থাকে।

দশ. স্ত্রী বিশ্বস্ত ও অনুগত হওয়া

স্ত্রী অনুগত ও বিশ্বস্ত হওয়া চাই। কারণ, ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ নির্ভরযোগ্য সূত্রে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا، وَلَا فِي مَالِهِ

> *'নবী কারীম ﷺ-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কোন নারী সর্বোত্তম?" তখন তিনি বলেছিলেন, "যে নারীর দিকে তাকানো-মাত্রই স্বামীর অন্তর*

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫০৮২, অধ্যায় : বিবাহ। মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৫২৭

> *প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। কোনো নির্দেশ দেওয়া মাত্রই সে তা পালনে নিবিষ্ট হয়। নিজের ব্যাপারে এবং ধন-সম্পদ নিয়ে স্বামীর অপছন্দনীয় কাজগুলোর ক্ষেত্রে স্বামীর অবাধ্য হয় না।"'*[১]

পাত্রীর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য বোঝার উপায় হলো, প্রথম দেখা হবার দিন 'স্বামীর হক' সম্পর্কে তার কেমন ধারণা তা জেনে নিন। আল্লাহ ও রাসূল-প্রদত্ত স্বামীর অধিকার ও মর্যাদা স্বীকার করে কি না, তা সরাসরি জিজ্ঞেস না করে কৌশলে জেনে নিতে পারেন; নারীবাদের বিষ আছে কি না, বুঝার জন্য এটা দরকারি। পাশাপাশি এই পরিবারের মা, খালা, ফুফু ও অন্যান্য বোনদের পারিবারিক বোঝাপড়া ও মিল-মহব্বতের বিষয়েও খোঁজ নেয়া যেতে পারে।

এগারো. স্ত্রী হতে হবে সৎ স্বভাবের, ক্ষীণস্বরী

সাম্প্রতিক সময়ে স্ত্রীর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীর মাঝে কঠোর স্বভাব ও স্বামীর উপর খবরদারির প্রবণতা থাকে। এটা বুঝতে হলে মেয়ের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে হবে মেয়ের মা কেমন। যে মেয়ে ছোটবেলা থেকে এটা দেখে বড় হয়েছে যে, তার মা তার বাবার সাথে চিৎকার-চেঁচামেচি করে, স্বভাবতই সে ভেবে নেবে স্বামীকে এভাবেই টাইট দিয়ে রাখতে হয়। একেই সে স্বাভাবিক আচার হিসেবে নেবে। মুখরা নারীর মেয়েও মুখরা হবে, এটাই ধরে নেয়া যায়। স্বল্পভাষী, ক্ষীণস্বর স্ত্রী আল্লাহর নিয়ামত।

বারো. পাত্র-পাত্রী শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্ত হতে হবে

দ্বীন-ইসলাম পাত্রী বাছাইয়ের সময় বিবেক ও শরীরের সুস্থতা এবং শক্তির প্রতি লক্ষ করতে নির্দেশ দিয়েছে। একারণেই যদি স্বামী-স্ত্রীর কারো মাঝে এমন কোনো অসুস্থতা দেখা দেয়, যা দাম্পত্যজীবনে বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে ইসলাম তাদের মাঝে বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছে। যৌন অক্ষমতা, পুরুষাঙ্গ কর্তন, মানসিক রোগ, কুষ্ঠ বা শ্বেত রোগ থাকলে উভয়েরই অধিকার রয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদের (ফিকহগত কিছু মতভেদ আছে)।

---

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৯৫৮৭, ৯৬৫৮; নাসায়ী, হাদীস-ক্রম : ৩২৩১। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে ইমাম আহমাদের বর্ণিত হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। সহীহ লিগাইরিহি।

নবী কারীম ﷺ বলেন—

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ

> *'কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করো যেভাবে সিংহ থেকে পলায়ন করে থাকো।'*[১]

তিনি আরও বলেন—

لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

> *'কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যেন কোনো সুস্থ ব্যক্তির পাশে না যায়।'*[২]

হাদীস দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও পাত্রী যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও একটি মূলনীতি নির্দেশ করছে।

সুতরাং বিবাহের আগেই পাত্র-পাত্রীর জন্মগত ত্রুটি থাকলে বা কোনো বড় অসুখ থাকলে তা উভয়পক্ষেরই জানার অধিকার রয়েছে, যাতে পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়। কোনো পক্ষই যেন নিজেকে প্রতারিত মনে না করে। অনেক সময় দেখা যায়, বিচ্ছেদ না হলেও মনে অশান্তি নিয়ে, নিজেকে প্রতারিত ভেবে জীবন কাটাতে হয়, যা কাম্য নয়। এজন্য বিয়ের আগেই পাত্র-পাত্রীর নিচের পরীক্ষাগুলো করানো উচিত এবং রিপোর্টগুলো একজন ডাক্তারকে দেখিয়ে পরামর্শ নেয়া দরকার—

- ☑ রক্তের গ্রুপ
- ☑ হেপাটাইটিস বি, সি
- ☑ এইডস
- ☑ সিফিলিস
- ☑ গনোরিয়া
- ☑ আল্ট্রাসনোগ্রাফি

বিবাহ মানে দুজন মিলে একটি নতুন জীবন শুরু করা। কীভাবে জীবন শুরু করলে একটি আদর্শ ইসলামী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হবে, পুণ্যবান বংশধর ও

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৯৭২২; শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে ইমাম আহমাদের সনদটি যঈফ হলেও এর সমার্থক সহীহ বর্ণনা রয়েছে। সনদ সহীহ লিগাইরিহি।

[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫৭৭১, অধ্যায় : চিকিৎসা

আল্লাহভক্ত প্রজন্মের সৃষ্টি হবে, সেদিকে নারী-পুরুষ উভয়কেই খেয়াল রাখা চাই। তখন নিজেদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সহজ মনে হতে থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই নিজের জন্য আদর্শবান পরিবার গঠন করা এবং ভবিষ্যতে আদর্শবান প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কী করণীয়, তা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এগুলো কখন হবে? যখন পরিবারটি একটি শক্ত খুঁটি পাবে, যার ওপর দ্বীনসম্মত লালন-পালন, পারিবারিক পরিশুদ্ধি এবং আদর্শ পরিবার গঠন হওয়া-টা নির্ভর করে। আর সেই খুঁটিটি কী? খুঁটিটি হচ্ছে—একজন পুণ্যবতী স্ত্রী।

তেরো. স্ত্রী ঘর-গৃহস্থালীতে পারদর্শী হতে হবে

রোজগার পুরুষের দায়িত্ব এবং পুরুষের জন্য ফরজ।[১] নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে নাজায়েয। আর নারীর জন্য সাধারণ নিয়ম হলো, নারী ঘরে থাকবে, প্রয়োজন না হলে বাইরে যাবে না, এবং ঘরের দায়িত্বগুলো পালন করবে।[২] এটা হলো জেনারেল রুল। **নারীপুরুষের দায়িত্ব**

---

[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব।' [তাবারানী, আল মুজামুল আওসাত : ৮/২৭২। হাদীস-ক্রম : ৮৬১০। সনদ হাসান গরীব।]

অপর এক বর্ণনায় নবীজি ﷺ বলেন : طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ অন্যান্য ফরজ ইবাদাতের পর হালাল উপার্জনের সন্ধান করাও ফরয। [বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা : ৬/২১১, হাদীস-ক্রম : ১১৬৯৫। সনদ দুর্বল। তবে ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবীর মতে হাসান গরীব। আল মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা-ক্রম : ৪৪২; হাদীস-ক্রম : ৬৬১।]

ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'জ্ঞানান্বেষণ যেভাবে ফরয, জীবিকা-অন্বেষণও সকল মুসলিমের জন্য সেভাবে ফরয। যেহেতু জীবিকা উপার্জন ছাড়া ফরয দায় দায়িত্ব পালন করা যায় না, সেহেতু জীবিকা উপার্জন ফরয; ঠিক যেভাবে সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জন ফরয। [ইমাম মুহাম্মাদ, কিতাবুল কাস্ব, ৪৭]

[২] আল্লাহ তাআলা নবী-পরিবারের নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

> *'তোমরা নিজেদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো। এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িয়ো না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান, তোমাদের নবী-পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে। [সুরা আহযাব আয়াত-ক্রম : ৩৩]*

ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'এটিই প্রকৃত ও মৌলিক আদেশ'। অর্থাৎ নারী গৃহে অবস্থান করবে। ফাতহুল বারী : ৮/৫১৯, ৫২০; ৪৭৮৫ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায়। আল্লামা শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ

ভিন্ন ভিন্ন ও সমান গুরুত্বপূর্ণ, পরিপূরক। একটা ছাড়া আরেকটা অসম্পূর্ণ। এবং এই আলাদা আলাদা দায়িত্ব পালন যার যার উপর ওয়াজিব।[১]

নারী বাইরে কাজ করলে লাভ পুঁজিপতিদের। ক্ষতি নারীর শরীরের, ক্ষতি পুরুষের মনের, ক্ষতি আগত-অনাগত প্রজন্মের। ক্ষতি আমাদের। নারীর বায়োলজি ও সাইকোলজির সাথে মিল রেখে তার কর্মক্ষেত্র আপন ঘরে আরামের সাথে প্রজন্মের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ। আর পুরুষের বায়োলজি-সাইকোলজির সাথে মিলিয়ে তার কর্মক্ষেত্র বাইরে কষ্ট-মেহনত করে অর্থ-রসদ উপার্জন। এই কর্মবণ্টন স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ-প্রদত্ত, এবং তা মান্য করা ওয়াজিব। তবে যে নারীর রোজগারের পুরুষ নেই, তার ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

সুতরাং উচ্চ ডিগ্রির চেয়ে পরিবার গঠনে বেশি জরুরি গৃহস্থালী কাজ-কর্ম ও রান্না-বান্নায় পাত্রীর পারদর্শী হওয়া। মেয়েরা স্বভাবগতভাবেই পরিপাটি হয়ে থাকে। পরিপাটি নারীর স্বামী বাড়ির প্রতি আগ্রহী হয়। সাজানো-গোছানোর কারিগর স্ত্রীটির প্রতি স্বামীর ভালোবাসাও হয় আকাশচুম্বী। সে-সুখ বোঝার কথা নয় বিধ্বস্ত শরীরে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা 'স্রেফ আত্মমর্যাদাকামী কর্মজীবী' নারীদের।

পাত্রীর ভেতর নারীবাদের বিষ রয়েছে কিনা, এটা শনাক্ত করা ভীষণ জরুরি। এমনকি বাহ্যিকভাবে দ্বীনদার অনেক বোনের ভেতরেও নারীবাদী ও শরীয়াহ-বিরোধী কুফরী চেতনা লক্ষ্যণীয়। এজন্য পাত্রীর সাথে সামনাসামনি দেখা করার সময়ই কিছু ব্যাপার ক্লিয়ার হয়ে নেয়া দরকার।

- ☑ বিবাহের পর চাকরি করতে চায় কি না।
- ☑ বিবাহের পর গৃহস্থালি কাজের ব্যাপারে কেমন মানসিকতা, এগুলো দায়িত্ব মনে করে কি না।
- ☑ স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে কিছু হাদীস বলে নেবেন। এরপর বলবেন, স্ত্রী-সম্পর্কে শরীয়ার সকল হুকুম মেনে চলতে আপনি বদ্ধপরিকর। এবার স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে কিছু হাদীস শুনতে চান, দেখুন বলে

বলেন, 'এর অর্থ এই যে, আল্লাহ মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে বসবাস ও অবস্থান করতে আদেশ করেছেন।' ফাতহুল কাদীর : ৪/৩১৯, ৩২০; উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

[১] তাফসীরু মাআরিফিল কুরআন, সূরা নিসা ৩৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর।

কি না। যদি না বলে, আপনি নিজেই কিছু হাদীস বলুন। যেমন 'যদি কাউকে সিজদার অনুমতি থাকত, স্ত্রীদেরকে বলতাম স্বামীকে সিজদা করতে', 'যে নারীর স্বামী তার উপর খুশি, সে জান্নাতী'। বলে দেখুন, হাদীসের প্রতি প্রতিক্রিয়া কী। অম্লানবদনে মেনে নিচ্ছে, নাকি কাউন্টার যুক্তি-ব্যাখ্যা ইত্যাদি দাঁড় করাচ্ছে।

চৌদ্দ. পতিব্রতা নারী

নবী কারীম ﷺ বলেন—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بِيَدِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ وَاللهِ لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى

> *'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী নারীদের (গুণাগুণ সম্বলিত নারীদের) কথা বলব না? তারা স্বামী-সোহাগিনী, অধিক সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং বারবার স্বামীর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। যদি কখনও তার প্রতি অবিচারও করা হয়, তবুও সে বলে—আমার স্বামী, এই যে আমার হাত আপনার হাতে রাখলাম। আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাব না।'*[১]

বারবার স্বামীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করা—এটি পুণ্যবতী স্ত্রীর একটি অনিন্দ্য গুণ। নবী কারীম ﷺ নিজেই এই গুণটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তার প্রতি যদি স্বামী অবিচার করেও ফেলে, তবু সে উগ্রতা দেখায় না, ঝগড়া করে না। বরং নিজেই আরও নতজানু হয়, স্বামীকে বলে আপনিই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করে আমার উপর যতক্ষণ না আপনি তুষ্ট হচ্ছেন, আমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলাম। আরেক হাদীসে নবীজি সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল বলেছেন—

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا

---

[১] নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, ৮/২৫১ [৯০৯৪]। বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ১১/১৭১ [৮৩৫৮]। সনদ হাসান সহীহ।

> 'যে ব্যক্তি নিজে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া-তর্ক পরিহার করে, আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মাঝে একটি গৃহনির্মাণ করে দেয়ার দায়িত্ব নিলাম।'[১]

এটাই ইসলামের মেজায।

সে নিজে তো স্বামীর প্রতি কখনো অবিচার করেই না, বরং যখন স্বামী তার প্রতি অবিচার করে, তখন নিজে ছোট হয়ে মীমাংসার জন্য সে নিজেই যায় স্বামীর কাছে। এই স্বামী-মুখিতা, পতিব্রত-কে নবী কারীম ﷺ জান্নাতী রমণীদের গুণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এই হাদীসটির মাঝে সকল মুসলিম নারীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও কৌশল রয়েছে। সেটি এই যে, নারীদের পূর্ণ শক্তি তাদের দুর্বলতার মাঝেই নিহিত। নিজেকে অনুগত-বাধ্য-দুর্বল-কোমল করে উপস্থাপন করলে তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে। তার জন্য স্বামী সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকবে—তার সব অধিকার, সব দাবি পূরণের পরও আরও সহযোগিতা, আরও ইহসান করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। নিজের সাধ্যমতো স্ত্রীকে খুশি করতে, নিজের সাধ্যানুপাতে শ্রেষ্ঠ জিনিসটি নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে। এটা পুরুষের ফিতরাত বা সহজাত স্বভাব।

আর সমযোগ্যতা-সম্পন্ন বা সমান প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করাও পুরুষের স্বভাব। বর্তমান প্রচলিত মুখরোচক 'নারী-পুরুষ সমতা'র গান নারীর জীবনকে আরও কঠিন করেছে। সংসারে নারী যখন নিজেকে পুরুষের প্রতিপক্ষ, পুরুষের সমান বানাচ্ছে তখন আগের সহজাত সিস্টেমটা আর কাজ করছে না। পুরুষের মায়া-সহানুভূতি-প্রেম তখন লোপ পাচ্ছে, অবচেতন মনেই জন্ম নিচ্ছে যুদ্ধংদেহী ভাব।

দাম্পত্য সম্পর্কগুলোর অবনতি কেন হচ্ছে, এ বিষয়ে University of Nebraska-Lincoln-এর দুজন গবেষক Stacy J. Rogers এবং Paul R. Amato দুই প্রজন্মের ডেটা নিয়ে গবেষণা করেন, যারা ১৯৬৯-১৯৮০-এর মাঝে বিয়ে করেছে এবং যারা ১৯৮১-১৯৯২-এর মাঝে বিয়ে করেছে।[২]

---

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৮০০, অধ্যায় : শিষ্টাচার। সনদ হাসান।

[২] Stacy J. Rogers & Paul R. Amato (1997). Is Marital Quality Declining? The Evidence from Two Generations. Social Forces, Vol.75, No.3, pp. 1089-1100

দুই প্রজন্মের Marital Quality বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখেন, আগের জমানার চেয়ে বর্তমান সময়ে দাম্পত্য সম্পর্কের মান ব্যাপক কমে গেছে। এর পেছনে কারণগুলো হলো—

১. ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। যা দাম্পত্য সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। (Hernandez ১৯৯৩, Zill & Nord ১৯৯৪)

২. মা-দের শ্রমবাজারে গণহারে যোগদান (US Bureau of the Census, Fig.২১, ১৯৯২)। ফলে বেড়ে যায় 'পরিবার vs ক্যারিয়ার' সংঘাত।

৩. ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে নারী-পুরুষ উভয়েই, বিশেষ করে নারীরা এতকাল ধরে চলে আসা পারিবারিক ভূমিকার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। (Thornton ১৯৮৯) ফলে পরিবারে সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

৪. দাম্পত্য সমস্যা ও ডিভোর্সের অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর হলো—লিভ-টুগেদার কালচার (premarital cohabitation)। এটা এখন খুব কমন ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। (Booth & Johnson ১৯৮৮)

৫. মূল্যবোধগুলো হয়ে গেছে আত্মকেন্দ্রিক (individualistic values)। আমেরিকার কালচারে 'সারাজীবন একসাথে থাকা' ব্যাপারটা আর নেই (Bellah et.al. ১৯৮৫; Popenoe ১৯৮৮)। ফলে আত্মকেন্দ্রিক দম্পতি পরস্পরকে ছাড় দিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা কমিয়ে দিয়েছে।

তাঁরা বলছেন, যদিও এর কিছু কিছুর পজিটিভ ফলাফল আছে (যেমন : নারীর অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি)। কিন্তু এই প্রতিটি ফ্যাক্টর দাম্পত্য-জীবনকে টানাপোড়েনে ফেলতে পারে। তাঁরা জানাচ্ছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৫৯-সাল পর্যন্ত তালাকের হার স্থিরই ছিল। ১৯৬০-এর শুরু থেকে তা বাড়তে থাকে। ১৯৬৬-১৯৭৬-এ তা হয়ে যায় দ্বিগুণ। ১৯৮০ সালে এই দ্বিগুণের লেভেলই স্থির থাকে। ১৯৯২ সালে এসে আমেরিকায় প্রথম বিয়ের অর্ধেকই ডিভোর্স হয়ে যায় (Cherlin ১৯৯২)। দেখুন, আমেরিকার ৯০-এর

দশকে যে অবস্থা, আজ বাংলাদেশ সেই সময়টা পার করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, গত সাত বছরে তালাকের প্রবণতা ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক বেশি হচ্ছে।[১] প্রথম আলো'র[২] মতে, ঢাকা শহরে গড়ে **প্রতি ঘণ্টায় একটি করে তালাকের আবেদন** করা হচ্ছে।

দুই সিটি করপোরেশনের তথ্য বলছে, স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের আবেদন বাড়ছে।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণে তালাকের আবেদনের প্রায় **৭০ শতাংশই স্ত্রীর পক্ষ** থেকে এসেছে।

কেন মেয়েরা এত তালাকে আগ্রহী? জবাবে সমাজ-বিজ্ঞানী প্রফেসর মেহতাব খানম 'দৈনিক ইনকিলাব'-কে বলেন,[৩] দুটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়ছে।

- ☑ **মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হচ্ছে।** তারা এখন অনেক সচেতন। মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য না করে ডিভোর্সের পথ বেছে নিচ্ছে।
- ☑ মেয়েরা আগের চেয়ে বেশি শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হওয়ায় আত্মঅহংকার বেড়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধন মানতে নারাজ তারা।

বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, '**নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সহনশীল মনোভাব থাকা। তারা সহনশীল থাকলে তালাকের পরিমাণ এত বাড়ত না।** এজন্য এই না যে নারীর প্রতি নির্যাতন হচ্ছে না। নির্যাতন হলেই সরাসরি তালাক দিতে হবে তা না; কিছুদিন দেখে-বুঝে তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, তাহলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব। ক্ষমতায়নের কারণে নারী তালাকে পুরুষের চেয়ে এগিয়ে গেছে। পারিবারিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা ধরে রাখলেই এই সংখ্যা কমানো সম্ভব।

অর্থাৎ নারী আর নিজেকে দুর্বল ভাবছে না, বাধ্যতা-আনুগত্য শব্দগুলোকে মেয়েরা ঘৃণা করছে। সবল-দুর্বল মিথোজীবিতা-নির্ভরশীলতা-মমতা-সুরক্ষাদান

[১] দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস, বিবিএস, জুন ২০১৭
[২] ঢাকায় ঘণ্টায় এক তালাক, [প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০১৮]
[৩] ফারুক হোসাইন/সায়ীদ আবদুল মালিক, বিচ্ছেদ ভয়ঙ্কর, [দৈনিক ইনকিলাব ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭]

—এই ন্যাচারাল ফ্যাক্টরগুলো অকেজো হয়ে 'সমানে সমান' স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে সম্পর্কের ভেতর। ফলে নারী-পুরুষ ন্যাচারাল সাইকোলজি-বিরুদ্ধ এই চেতনা পরিবারের ন্যাচারাল গাঁথুনি নষ্ট করছে। পরিবার পরিণত হয়েছে স্রেফ ৫০-৫০ শেয়ারের পার্টনারশিপে। পাঠ্যক্রমে নারীবাদ শেখানো হচ্ছে, নারীবাদের বিষাক্ত সব দর্শন শিশুবয়স থেকেই ঢুকানো হচ্ছে বাচ্চাদের মগজে। নারীশিক্ষা, নারীমুক্তি, নারী-অধিকার, নারীপ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন— ইত্যাদি মুখরোচক শব্দের আড়ালে কদর্য নারীবাদী দর্শন চোখ বুঁজে গিলে নিচ্ছে আমাদের মেয়েরা। যার প্রভাব গিয়ে পড়ছে দাম্পত্য সম্পর্কের উপর, ভুক্তভোগী হচ্ছে ভবিষ্যত প্রজন্ম।[১]

পতিব্রতা নারীর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে যদি বিত্তশালী হয়, তাহলে তার ধন-সম্পদ দিয়ে স্বামীকে সহযোগিতা করবে। এমন অর্থও আসতে পারে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র স্ত্রী যাইনাব প্রায়ই স্বামীকে আর্থিক সমর্থন যোগাতেন।[২]

এ ছাড়া যে নারী স্বামীর ধন-সম্পদ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেগুলো নষ্ট হতে দেয় না সেও পতিব্রতা। স্বামীর মালামাল হেফাজত করার মাধ্যমে সে যেন তার স্বামীকে সরাসরি ধন-সম্পদ দিয়েই সহযোগিতা করছে। আর ঘরোয়া দায়িত্বগুলো আদায় করার দ্বারা স্ত্রী আসলে স্বামীর সম্পদকে বৃদ্ধিই করছে। মাস-শেষে পরিবারের পুরুষ যে টাকাটা সঞ্চয় করে, সেটা মূলত নারীরই শ্রমের ফসল। নারী যদি ঘরে কাজ না করত, তাহলে ঐ কাজগুলো করিয়ে নিতে পুরুষের ঐ সঞ্চয় খরচা হয়ে যেত। সুতরাং ঐ সেভিংসটাই নারীর উৎপাদন। এভাবে নিজে পরিশ্রম করে সে স্বামীর সম্পদকে বৃদ্ধি করল। এ হিসেবে নারীর ইনকাম আরও বেশি। নারীর ঘরের কাজকে টাকায় পরিণত করলে তা পুরুষের ইনকামেরও ২-৩ গুণ বেশিই হবে।[৩] সংসারে দুজনার পারস্পরিক মূল্যায়ন

[১] বিস্তারিত পাওয়া যাবে ডা. শামসুল আরেফীন রচিত 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০' বইটিতে।

[২] সহীহ বুখারী, ১৪৬২। অধ্যায়ঃ যাকাত। তবে হানাফি উলামাগণের মতে স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়।-রদ্দুল মুখতার : ২/২৫৮

[৩] গবেষণায় এসেছে—non-SNA [System of National Account] কাজে নারীদের কাজের চাপ ও সময় পুরুষের চেয়ে ৩ গুণ বেশি। "Women's Unaccounted Work and Contribution to the Economy"-নামের স্টাডিতে পাওয়া গেছে, যদি নারীর এই ঘরের কাজকে টাকায় পরিণত করা হয় তাহলে তা দাঁড়াবে জিডিপির ৭৬.৮% থেকে ৮৭.২%। বেতনভুক্ত আয়ের চেয়ে তা ২.৫ থেকে ২.৯ গুণ বেশি। [Staff Correspondent (June 11, 2019). Include unpaid work of women in GDP. The Daily Star]

তখনই হবে যখন স্ত্রীর স্বামীপরায়ণতা ও স্বামীর স্ত্রী-সহমর্মিতা-ফ্যাক্টর একসাথে কাজ করবে।

পনেরো. স্ত্রী স্বামীর গোপন বিষয়ের হেফাজতকারী ও বিচক্ষণ হওয়া[১]

একজন নারী তার দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিন থেকে কতটা বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারে তা জানার জন্য কাযী শুরাইহ রাহিমাহুল্লাহ'র একটি ঘটনাই যথেষ্ট। কাযী শুরাইহ বলেন, 'বিয়ের রাতে স্ত্রী আমাকে বলল, "আমি একজন অপরিচিত নারী। আপনার চাওয়া-পাওয়া ও পছন্দ-অপছন্দ কিছুই আমার জানা নেই। তাই আপনার পছন্দের বিষয়গুলো বলুন যেন আমি তা করতে পারি। আর অপছন্দনীয় বিষয়গুলোও বলুন যেন সেগুলো থেকে বিরত থাকতে পারি।"' কাযী শুরাইহ তাঁর পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলো জানান। তাঁর স্ত্রী সেগুলো এতটা যত্নের সাথে মেনে চলতেন যে, কাযী শুরাইহ বলেন, '২০ বছর সে আমার সঙ্গে ছিল। **কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে সে এমন কোনো কাজ করেনি, যার কারণে তাকে ভর্ৎসনা করার প্রয়োজন পড়েছে। তবে একবার ব্যতীত; আর সেবারও ভুলটা আমারই ছিল।'** [২]

পাশাপাশি একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করাও একটি গুরুদায়িত্ব বটে। একে অপরের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়া বা অন্যের কাছে একে অপরের দোষচর্চা করে বেড়ানোতে অবশ্যই গীবত ও কুৎসা রটনার গুনাহ হবে। বিভিন্ন হাদীসে স্বামীর সম্পদ রক্ষার যে দায়িত্ব নারীকে দেয়া হয়েছে, তা শুধু সহায়-সম্পত্তি নয়। একজন মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও তার মূল্যবান সম্পদ। যার খিয়ানাত না করা চাই। সাধারণত কারও গোপন কিছু ফাঁস করে দেওয়া নিষেধ। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। আর এতে কোনো ক্ষতি বা কষ্টের আশঙ্কা থাকলে তা স্পষ্টরূপে হারাম। রাসূল ﷺ বলেছেন—

'إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ

> *যখন কেউ কোনো কথা বলে এদিক-ওদিক তাকায়, তবে (তার কথা শ্রোতার নিকট) আমানতস্বরূপ।'*[৩]

---

[১] এ বিষয়টি সম্পাদক আহমাদ ইউসুফ শরীফ কর্তৃক সংযোজিত।

[২] আল-ইকদুল ফরীদ, ২/১৯২; আল-মুসতাতরাফ, ২/১৮৬

[৩] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ৪৮৬৮, অধ্যায় : শিষ্টাচার। সনদ হাসান।

সেই সাথে স্বামীকেও স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে। রাসুল ﷺ বলেছেন—

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

> *'কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্ব-নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথে তার স্ত্রী মিলিত হয়, অতঃপর সে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।'*[১]

এমনকি কোনো দম্পতির কাছে তাদের একান্ত পারিবারিক বিষয়ে জানতে চাওয়াও নিষেধ। রাসুল ﷺ বলেছেন—

لا يُسأَلُ الرَّجُلُ: فيمَ ضَرَبَ امْرأَتَه

> *'কাউকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, সে তার স্ত্রীকে কেন মেরেছে।'*[২]

ষোলো. সরলমনা ও সহজ-সরল প্রকৃতির হওয়া

স্ত্রী হতে হবে সহজ-সরল প্রকৃতির। তার কথাবার্তা ও চালচলনে সরলতা প্রকাশ পাবে। কোনো লৌকিকতা থাকবে না। কিংবা তার মাঝে কোনো প্যাঁচ বা চোগলখোরি-গীবতের প্রবণতা থাকবে না। স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যে কোনো ধরনের লুকোছাপা থাকবে না।

নবী কারীম ﷺ বলেন—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ

> *'আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তিদের কথা বলব না, যাদের ওপর কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে? তারা হচ্ছে,*

[১] মুসলিম হাদীস-ক্রম : ১৪৩৭, অধ্যায় : বিবাহ।

[২] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২১৪৭, অধ্যায় : বিবাহ। হাদীসটির একজন রাবী দাউদ বিন আবদুল্লাহকে ইবনুল হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ মাকবুল ফিল মুতাবাআত বলেছেন। তবে দাম্পত্য কলহ আঁচ করতে পারলে তা মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশে উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি রয়েছে।

> *প্রত্যেক কোমলমনা, সহজ-সরল প্রকৃতির এবং খুবই মিশুক স্বভাবের মানুষ।'*[১]

সতেরো. স্ত্রী হতে হবে ইবাদাতগুজার ও অনুগত স্বভাবের

সে সময়মতো নামায পড়বে। এবং নফল নামায ও রোযার পাবন্দি করবে। কুরআন তিলাওয়াত করা ও মুখস্থ করার প্রতি আগ্রহী হবে। আবার সকাল-সন্ধ্যার আমলগুলোও ঠিকঠাক আদায় করবে। এগুলো জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া যেতে পারে পাত্রী দেখার সময়—

- ☑ কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে? বড় কোনো সূরা মুখস্থ আছে কি না?
- ☑ সপ্তাহে সোম-বৃহস্পতি রোযা রাখা হয় কি না?
- ☑ নফল সালাতের মধ্যে কোনোটা পড়া হয় কি না? তাহাজ্জুদ বা ইশরাক?
- ☑ জুমআর দিন সূরা কাহফ পড়া হয় কি না?

সবগুলোর উত্তর 'হ্যাঁ'-ই হতে হবে, তা নয়। তবে এতে করে দ্বীনদারির একটা আইডিয়া করা যাবে। নবী কারীম ﷺ বলেন—

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

> *'যে নারী সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রামাদান মাসে রোযা রাখবে, নিজের সতিত্ব রক্ষা করে চলবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, কিয়ামতের দিন তাঁকে বলা হবে, "তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে মন চায় সেদিক দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারো।"'*[২]

আঠারো. স্ত্রী পূত-পবিত্রা ও সতী হওয়া

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কোন নারী সর্বোত্তম?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যে নারী কথাবার্তার প্যাঁচ বুঝে

---

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ২৪৮৮; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৩৯৩৮। সনদ হাসান গরীব।
[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৬৬১। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে সনদ হাসান গরীব।

না। পুরুষদের ভোজবাজি সম্পর্কেও ধারণা রাখে না। একদম নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী। শুধু স্বামীর জন্য সাজগোজ করতে জানে। এবং তার পরিবারের সর্ববিষয়ে রক্ষণশীল হয়।'[১]

পাত্রীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, প্রতিবেশীদের কাছে খবর নিলে এসব বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে। বিবাহের জন্য ভার্সিটির দরজায় সদ্য পা দেয়া (প্রথম বর্ষ), বা একেবারেই পা না-দেয়া পাত্রীই উত্তম। কেননা, সেক্যুলার ভার্সিটির পরিবেশই এমন, সেখানে শুকনো ঘাস আর আগুন একসাথে জ্বলে না ওঠাটাই অস্বাভাবিক। একটু চেহারা-সুরত সুন্দর হলেই ১০টা ছেলের আহ্বান এসে পড়ে। আর ১০ আহ্বানের শ্রেষ্ঠ আহ্বানটা অস্বীকার করা মেয়েটির জন্যও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সুন্দরী মেয়ে, ভার্সিটি পাশ, হলে থাকত... ইতিহাস খারাপ হবার সম্ভাবনাই বেশি। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কঠোর পারিবারিক নিয়মের মাঝে থাকলে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকেও তার চালচলন সম্পর্কে আন্দায করা যায়। তবে ইতিহাস জানার চেষ্টা যা করবেন, বিয়ের আগে। বিয়ের পর তাকে আল্লাহর নিয়ামত মনে করে তার ইতিহাস জানার সব চেষ্টা সিলগালা করে দিতে হবে। স্ত্রীর আর কোনো খুঁত, কোনো অতীত খোঁজা নিতান্তই ছোটোলোকি।

আরেকটা বিষয় পাত্রীপক্ষের জন্য। পাত্রীর শারীরিক দোষত্রুটি থাকলে সেটা পাত্রপক্ষের সাথে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু পাত্রীর চারিত্রিক দোষ পাত্রপক্ষের সাথে আলোচনা নিষেধ। একবার উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে এসেছে পাত্রীপক্ষ—

> - 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের মেয়ের ব্যভিচারের ইতিহাস আছে। এটা কি আমরা পাত্রপক্ষকে জানাবো?'
>
> - 'খবরদার! যদি জানাও, তোমাদেরকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব।'[২]

---

[১] রাগিব আল আসফাহানী, মুহাযিরাতুল উদাবা, ২/২২২

[২] হান্নাদ ইবনুস সাররি, কিতাবুয যুহদ : ২/৫৪৭। সনদ সহীহ। এখানে সংক্ষেপে মূল বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

উনিশ. স্ত্রী সমমনা হওয়া

পাঠক, আপনি এমন মেয়েকে বিয়ে করবেন না, যে আপনার কাজকর্ম, ওঠাবসা, চালচলন, স্বভাব-চরিত্র—সবদিক থেকে আপনার বিপরীতমুখী হয়। কারণ, এই বিষয়গুলো এমন যেগুলোর ওপর আপনাদের সংসার টিকে থাকবে। আপনাদের মধ্যকার রুচিগত, চিন্তাগত দূরত্ব যত বাড়তে থাকবে; তত আপনাদের পারিবারিক সুখশান্তি নিঃশেষ হতে থাকবে। আর আপনারা যত বেশি পরস্পরের আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র ও রুচি-পছন্দগুলোতে সমমনা হতে পারবেন, তত বেশি দাম্পত্যজীবনে সুখী হবেন। এজন্য অনেকেই দূরদেশের পাত্রীর চেয়ে নিজ এলাকার মেয়ে বিয়ে করতে উৎসাহিত করেন। কেননা রুচি-পছন্দ, আচার-মূল্যবোধ কমন থাকে।

এগুলো হলো একজন আদর্শ স্ত্রীর গুণ; যে গুণ-সমৃদ্ধা স্ত্রীকে প্রত্যেক মুসলিম যুবকই নিজের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায়। আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন, তিনি যেন প্রত্যেক পুণ্যবান নর-নারীকে গুণগুলো অর্জনের সামর্থ্য দান করেন। এবং তাদেরকে দুনিয়াতে তার আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর পরকালে সবাইকে প্রবেশ করান স্বপ্নের জান্নাতে।

ছয় শ্রেণির নারীকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকা–

জ্ঞানীরা বলেন, 'ছয় শ্রেণির নারীকে বিয়ে করো না। অনেক বেশি অনুযোগ-অভিযোগকারী, কথায় কথায় খোঁটা দেওয়ায় অভ্যস্ত, অন্যের প্রতি বেশি সোহাগী, স্বল্পে আগ্রহী নারী, অতিমাত্রায় চটকদার এবং মুখরতার অধিকারী।'[১]

অনুযোগকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অনেক বেশি আদিখ্যেতা ও অভিযোগে অভ্যস্ত। সুতরাং অল্পেকাতর মেয়ে বা শরীর নিয়ে অহেতুক পেরেশান নারীকে বিয়ে না করার মাঝে কল্যাণ নিহিত।

খোঁটার অর্থ হলো, কথায় কথায় স্বামীকে খোঁটা দিয়ে বলে, 'আমি তোমার জন্য

---

[১] আবু উসমান আল জাহিয (মৃত্যু : ২৫৫ হি.), আল-মাহাসিনু ওয়াল আযদাদ, ২০০। আবু উসমান আল জাহিয হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই বর্ণনাটি আরবে খুবই প্রসিদ্ধ। বহু গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন, মুফীদুল উলূম (আবু বকর আল-খাওয়ারিজমী, ৩৮৩ হি.), ৩৯৮। আল মুহকামু ওয়াল মুহীতুল আ'যাম (ইবনু সায়্যিদিহি, ৪৫৮ হি.), ১০/৪৭৪। ফাসলুল মাকাল (আবু উবাইদ আল-বাকরি, ৪৮৭ হি.), ১৪। লিসানুল আরব, ১৩/২৮।

এটা-ওটা করেছি', 'আমি বলেই তোমার সংসার করলাম' ইত্যাদি।

অন্যের প্রতি সোহাগী অর্থাৎ, তার অন্য স্বামীর প্রতি স্মৃতিকাতর বা অন্য স্বামীর ঔরসজাত সন্তানের প্রতি টান বেশি হয়। এমন মেয়েকে বিয়ে করা থেকেও দূরে থাকা উচিত।

স্বল্পে আগ্রহী অর্থাৎ, কোনো জিনিসের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সেটার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায়। আর এর কলঙ্কের বোঝা স্বামীকে বহন করতে হয়।

চটকদারের অর্থ দুইভাবে করা যায়। প্রথমত, স্ত্রী দিনের অর্ধেকটা সময় নিজের রূপচর্চা এবং সাজুগোজের মাঝে কাটিয়ে দেয়। যাতে তার এই কারুকার্যের দ্বারা নিজের চেহারার মাঝে আলাদা একটা চাকচিক্য প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, রাগ করে খাবার-দাবার ছেড়ে দেয়। আবার একা একা ঠিকই খেয়ে নেয়। সবকিছুতেই সে নিজেকে কেমন যেন স্বাবলম্বী ভাবে।

মুখরতার অর্থ হচ্ছে, বাচাল। অতিমাত্রায় কথা বলে।[১]

[১] আবু বকর আল-খাওয়ারিজমী (৩৮৩ হি.), মুফীদুল উলূম, ৩৯৮। অনুবাদক কিছুটা পরিমার্জন করে উল্লেখ করেছেন।

মা
মহাপুরুষ তৈরির নির্মাণশিল্পী

যেসব মহাপুরুষ, বীরপুরুষদেরকে নিয়ে উম্মাহ গর্ব করে তাদেরকে উম্মাহর জন্য এভাবে তৈরি করে দিয়েছেন একেকজন পুণ্যবতী নারীই। সে নারী তো একাই এক সমাজের অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেক তাঁর জরায়ুকোঠরে জন্মায়, তাঁর কোলে পুষ্টিলাভ করে। এভাবেই একজন পুণ্যবতী নারীর মাঝে কেবল একটি শিশু নয়, গোটা একটা জাতি জন্ম নেয়, পুরো উম্মাহ্ নবজীবন লাভ করে।

এ-কারণেই আমরা এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে আগেকার পুণ্যবতী নারীদের কিছু নমুনা পেশ করতে চাই। ইবাদাত-বন্দেগী, বদান্যতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আখলাক এবং আত্মবিসর্জনের ক্ষেত্রে কী দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে, তা জানা অত্যন্ত জরুরি। তাহলে আমাদের বুঝে আসবে, কীভাবে তাঁরা এমন মহাপুরুষ ও বীরপুরুষদের তাঁদের কোলে জন্ম নিয়েছেন। এটাও পরিষ্কার হবে, কীভাবে উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনকারী বীর সিপাহি দুনিয়াতে আনতে হয়, আর কেনই-বা আমাদের দ্বারা সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, তারিক ইবনু যিয়াদ, মুহাম্মদ ইবনু কাসিম-রা দুনিয়াতে আসছেন না।

মা হচ্ছেন মহাপুরুষ তৈরির নির্মাণশিল্পী–

এমন এক যুগ বিগত হয়েছে, যেসময় মুসলমানদের ক্ষমতা-বিক্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। তারা বিশ্ববাসীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাগুতের রাজদরবার বিধ্বস্ত করেছে। আন্দালুস থেকে কাশগড়, সোমালিয়া থেকে তাতারিস্তান পর্যন্ত কালিমার পতাকা স্থাপন করেছে। বিশ্বময় ছড়িয়েছে নিজেদের ধর্ম, রীতিনীতি, ভাষা, বিদ্যা-বুদ্ধি, সভ্যতা।

কোন বিদ্যালয়ে তাদের পড়াশোনা? কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তাদের গ্রাজুয়েশন? কোনটা রেখে কোনটার কথা বলি—মুসলমানদের প্রতিটি কুঁড়েঘর, প্রতিটি তাঁবু, ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ-অট্টালিকা, মসজিদ—সবগুলোই ছিল একেকটা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, একেকটা ইনস্টিটিউট। আল্লাহর কাছে নিজেদের অযোগ্যতার জন্য মাফ চাই, আমরা ধরে রাখতে পারিনি সেই স্বর্ণযুগ, নিজেদেরই গাফলতি আর অলসতায়।

দ্বীনী চেতনার বাহক সেইসব মুজাহিদ-দাঈ-আলিম-শাসকের প্রথম বিদ্যালয় ছিল তাঁদের পুণ্যবতী মায়েদের কোল। সেই কচি চারাগুলোর প্রথম মালিনীদের নিরলস জলসিঞ্চনই উম্মাহর বীরদের চেতনার বুনিয়াদ। সেই বুনিয়াদেই মহীরুহ হয়েছেন তাঁরা। ফল দিয়ে ছায়া দিয়ে আগলে নিয়েছেন উম্মাহকে। কৃতিত্ব তো সেই মালিনীদের যাঁরা দ্বীনের প্রাথমিক আদর্শ, আল্লাহ-রাসূলের ভালোবাসা, কুরআন-সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা সেই কচি মনে পুঁতে দিয়েছিলেন।

এই পুণ্যবতীদের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা উম্মাহকে আদর্শহীন হয়ে বেড়ে ওঠা থেকে রক্ষা করেছিলেন। কাফির নেপোলিয়নও বুঝেছিলেন—'আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।' একজন মা-ই হয়ে ওঠেন একটি জাতি। পথহারা জাতিকে পথ দেখান একজন মা-ই তাঁর নাড়িছেঁড়া বাতিখানি উচ্চে ধরে। আর মা যদি হন উদাসীন-চরিত্রহীনা-অবাধ্য-বেদ্বীন, তাহলে ধুতরা গাছ থেকে ধুতরা ফল ছাড়া আর কী আশা করতে পারে উম্মাহ?

এই মনীষীরা মহিয়সী মুসলিম মায়েদের অবদান–

ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখুন। এমন বহু মুসলিম মহিয়সী নারীর সন্তানদের সাথে আপনার পরিচয় হবে, যাঁদের সামনে দ্বীনের শত্রুরা মাথা নত করেছে। উদ্ধত সব সাম্রাজ্য যাদের করায়ত্তে এসেছে। কিন্তু তাঁদের দৈহিক অস্তিত্বের অবদান তো নিঃসন্দেহে মায়েরই দশমাস কষ্টের ফসল। তাঁদের মনন-বীরত্ব-প্রজ্ঞা-মেধার অবদানও তাঁদের পুণ্যবতী মায়ের প্রতিই বর্তায়। একজন পুরুষকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা, তার মাঝে প্রভাব-প্রতিপত্তি সঞ্চার করা, তার অন্তরে দ্বীনের জন্য কুরবানী ও কর্মতৎপরতা বদ্ধমূল করা, তার শিরা-উপশিরা ও অন্তরাত্মার মাঝে মনীষীর গুণাবলি সৃষ্টি করে দেওয়া—এসব তো একজন মায়েরই অন্তর্জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের ফসল। একজন মুসলিম মা সন্তান প্রতিপালনের এমন এমন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কুশলী থাকেন, অন্যদের যা কল্পনায়ও আসে না।

✿ যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁ ও তাঁর সন্তানেরা

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁-এর কথাই ধরা যাক। তিনি তাঁর নির্ভীক সাহসিকতায় এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে একাই এক হাজার বীরের সমপরিমাণ ধরা হতো। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মিশরে যুদ্ধরত মুসলিম সেনাবাহিনীর জন্য অতিরিক্ত সাহায্য হিসেবে তাঁকে পাঠালেন, তখন পত্রমারফত জানিয়ে দিলেন মিশরের সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে—

> 'পর সমাচার, আমি আপনার কাছে প্রত্যেক এক হাজার সৈন্যের মুকাবিলায় চার হাজার (চার জন) সৈন্য পাঠালাম। তাদের প্রত্যেকেই এক হাজার সৈন্যের সমপরিমাণ। তারা হলেন : যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মিকদাদ ইবনু আমর, উবাদাহ ইবনুস সামিত এবং মাসলামাহ ইবনু খালিদ।'[১]

সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল উমর ﵁-এর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি। ইতিহাস লিপিবদ্ধ রেখেছে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু এক হাজার সৈন্যের সমপরিমাণ ছিলেন না; বরং তিনি একাই গোটা একটা জাতির সমপরিমাণ ছিলেন। তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীর গতিরোধকারী দুর্গে একাই প্রবেশ করেছিলেন। দালান বেয়ে উপরে উঠে সেখান থেকে একাই লাফিয়ে পড়েন শত্রুদের মাঝে। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে দুর্গের ফটকের দিকে ধাবিত হলেন। জীবনের পরোয়া না করে খুলে দিলেন ফটক। মুসলমানরা একযোগে দুর্গের ভেতর প্রবেশ করলেন। বিপুল বিক্রমে পরাস্ত করলেন শত্রুদের।

আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই এই বীরের মায়ের সাথে। জানতে চান কোন সিংহীর কোলে জন্মেছেন এমন সিংহ? নবীজি ﷺ-এর চাচা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয় 'আসাদুল্লাহ ও আসাদুর রাসূল' (আল্লাহ ও নবীর সিংহ)। তাঁর শখও ছিল সিংহ-শিকার। সেই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আপন বোন, নবীজির ফুফু সাফিয়্যাহ বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা। সিংহের বোন এই সিংহী ছিলেন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মাতা।

---

[১] ইবনু আবদিল হাকাম (২৫৭ হিঃ), ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব, ১/৮৩

কেমন সিংহী?

খন্দকের যুদ্ধ। মুসলিম পুরুষরা সবাই খন্দকের পাশে যুদ্ধরত। মুসলিম নারী-শিশুরা একটি দুর্গে, তাদের পাহারায় শুধু বৃদ্ধ কবি হাসসান ইবনু সাবিত, আর কোনো পুরুষ নেই। বিশ্বাসঘাতকতা করল বনু কুরাইযার ইহুদীরা। কুরাইশদের সাথে প্ল্যান হলো : বনু কুরাইযা শহরের ভেতর থেকে মহিলাদের দুর্গ আক্রমণ করবে, খবর শুনে পুরুষরা খন্দক থেকে সরে শহরের ভেতরে ছুটবে মহিলাদের বাঁচাতে। আর এই সুযোগে কুরাইশরা খন্দক অতিক্রম করবে, শহর দখল করবে। এই কাপুরুষোচিত প্ল্যানের প্রথম ধাপ হলো, ইহুদীদের দুইজন গেল মহিলাদের দুর্গ রেকি করার জন্য। মহিলাদের রক্ষার জন্য কজন পুরুষ আছে, নাকি কোনো পুরুষই নাই, ইত্যাদি দেখার জন্য। তো এই সিংহী সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা লক্ষ করলেন, কে যেন উঁকিঝুঁকি মারছে। হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'গিয়ে দেখে আসো কে। মতলব তো ভালো না।' তিনবার বললেন, হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজি হলেন না, বৃদ্ধ মানুষ। শেষমেশ সাফিয়্যাহ নিজে গিয়ে ইহুদীটাকে পিটিয়েই মেরে ফেললেন, একাই। তারপর তার মাথাটা কেটে দুর্গের বাইরে ছুড়ে দিলেন। সাথে যে আরেকটা ইহুদি ছিল, সে দৌড়ে গিয়ে খবর দিল বনু কুরাইযাকে : 'ভাইরে ভাই, দুর্গের ভেতর শক্তিশালী সব পুরুষ সৈন্য আছে, দুর্গ আক্রমণের চিন্তা বাদ দাও।'[১]

এই সাহসিনী মায়ের কোলেই প্রতিপালিত হয়েছেন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই মেজাযে বেড়ে উঠেছেন। এই চরিত্রে চরিত্রবান হয়েছেন। মা তাঁকে একজন সিপাহী এবং একজন অশ্বারোহী হিসেবে প্রতিপালন করেছেন। ধনুক মেরামত করা এবং তির চালনাকে তাঁর খেলার বস্তু বানিয়ে দিয়েছেন। সবধরনের ভয়ংকর জায়গায় তির নিক্ষেপ করার প্রশিক্ষণ তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক বিপজ্জনক জায়গায় ঢুকিয়ে দিতেন।

যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন পিছিয়ে যেতেন তিনি তাঁকে কঠিন শাস্তি দিতেন। এমনকি যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এক চাচা থেকে এ-কারণে সাফিয়্যাহকে তিরস্কার পর্যন্ত শুনতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আপনি তাকে একজন বিদ্বেষী নারীর ন্যায় শাসন করছেন, কোনো মায়ের শাসন তাকে করছেন না।'

[১] দ্রষ্টব্য : সীরাতু ইবনি হিশাম, ২/২২৮, অধ্যায় : খন্দকের যুদ্ধ।

তিনি এর জবাবে বলেছিলেন—

'যে ব্যক্তি বলে আমি যুবাইরের সাথে বিদ্বেষমূলক আচরণ করি, সে মিথ্যা বলে। আমি তাঁকে শাসন করি যেন সে ক্ষিপ্ত হয়। ফলে দুশমন পরাজিত হবে আর সে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসবে।'[১]

শ্রেষ্ঠ মনীষী আবদুল্লাহ, মুনযির, উরওয়া—এঁরা সবাই যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সন্তান। তাঁরাও ছিলেন তাঁদের মা আসমা বিনতু আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা'র মেজাযের। হাজ্জাজ আক্রমণ করেছে মক্কা। খলীফা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে। মায়ের কাছে এলেন শেষ পরামর্শ নিতে। মায়ের পরামর্শ কী ছিল জানেন? 'বেটা, বর্ম খুলে যুদ্ধে যাও, শাহাদাতপ্রার্থীর জন্য এসব মানায় না।'

এমন মায়ের সন্তান এঁরা।[২]

۞ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই জোড়া বাহুডোরে প্রতিপালিত হয়েছেন, যে দুই জোড়া বাহুতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশান্তি ও যত্ন লাভ করেছেন। তাঁর মা ফাতিমা বিনতু আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজির চাচি, আবু তালিবের স্ত্রী। আর নারীকুলশ্রেষ্ঠা আম্মাজান খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা'র ঘরে আদর-যত্নে তিনি বড় হয়েছেন। এই দুই মহৎপ্রাণ নারীর পবিত্র প্রভাবেই আলী হয়েছেন আলী মুরতাযা। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

۞ আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি ছিলেন আরবের বদান্যশীলদের সর্দার। যুবসমাজের মাঝে বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তাঁর বাবা জাফর ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মায়ের কোলে রেখেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর মা আসমা বিনতু উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতিপালনে বেড়ে ওঠেন। অত্যন্ত তেজস্বিনী নারী ছিলেন। হাবশায় হিজরতকারীদের অতিরিক্ত ফযীলতের হাদীসটি তাঁর

[১] ইবনু হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ ফি তমীযিস সাহাবাহ : ২/৪৫৮ [২৭৯৫]
[২] দ্রষ্টব্য : হাফিয ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়া নিহায়া : ৮/৩৬৪। ৭৩ হিজরীর আলোচনায়।

ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বাকবিতণ্ডার ফলে নবীজি উচ্চারণ করেন।[১] চিকিৎসাবিদ্যায় ছিলেন প্রসিদ্ধ।

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু

আমীরুল মুমিনীন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কথাই ধরা যাক। তাঁর মা হিন্দ বিনতু উতবাহ ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী। কুফরের উপর অটল ছিলেন আভিজাত্যের কারণে, দ্বীনে প্রবেশের পরও আত্মমর্যাদা দেখিয়েছেন দ্বীনের খাতিরে। নবীজির হাতে বাইআতের সময় নবীজি যখন বলছিলেন : 'বলো, যিনা করব না।' তাঁর উত্তর ছিল : 'স্বাধীন সম্ভ্রান্ত নারী আবার যিনা করে নাকি?' অত্যন্ত আত্মমর্যাদার কথা। বাইআত শেষে হিন্দ বলেন : 'আগে আপনার চেয়ে বড় কোনো দুশমন আমার ছিল না। আর এখন আপনার চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই। হিন্দ তো আর আগের হিন্দ নেই।'[২] ইয়ারমুকের যুদ্ধে স্বামী আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে অংশ নেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে পলায়নরত মুসলিম সেনাদের অপমান করে মেরে পিটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাচ্ছিলেন গায়রতের কারণে।[৩]

কোলের শিশু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'যদি মুয়াবিয়া তার জাতির নেতৃত্ব না দেয়, তাহলে আমি সন্তান হারানোর ব্যথা অনুভব করব।'[৪] সন্তানকে তিনি এমনভাবে বড় করেছেন, সেই আত্মবিশ্বাসের পরিচয় তাঁর এই কথাটি : 'আল্লাহর শপথ, যদি গোটা আরববাসী একত্র হয়ে মুয়াবিয়ার ওপর একযোগে তির নিক্ষেপ করতে থাকে তারপরও সে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে নেবে।'[৫]

---

[১] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় আগে হিজরত করার কারণে আসমা বিনতু উমাইসের উপর গর্ব প্রকাশ করেন। এতে আসমা বিনতু উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু লোক আমাদের উপর গর্ব করে বলে যে, আমরা অগ্রবর্তী মুহাজিরীনদের অন্তর্ভুক্ত নই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'বিষয়টি এমন নয়; বরং তোমাদের তো দুই হিজরত হয়েছে। প্রথম তোমরা হিজরত করে হাবশায় গিয়েছ, তারপর পুনরায় হিজরত করে আমার কাছে এসেছ।' বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৪২৩০; অধ্যায় : মাগাযী। মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৫০২

[২] মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৪৭৫৪; মুসতাদরাকু হাকিম : ২/৪৮৬; ইমাম হাকিমের সনদ সহীহ।

[৩] বালাজুরী, ফুতুহুল বুলদান : ১/১৬০

[৪] হাফিয ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮/১২৬। ৬০ হিজরীর আলোচনায়।

[৫] আল-ইকদুল ফরীদ : ২/ ৩২৯

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে কেউ বিবাদে লিপ্ত হতো, তখন তিনি তাঁর মায়ের প্রতি সম্পৃক্ত করে প্রতিপক্ষের কানে বলতেন, 'আমি কিন্তু হিন্দের ছেলে।'[১]

۞ উম্মু উমারা'র সন্তানগণ

তাঁর এক ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ আল-মাযিনী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভণ্ড নবী মুসাইলিমাহকে হত্যা করেছেন। তিনি 'হাররাহ'-এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এবং তাঁর ভাই হাবীব ইবনু যায়িদ ইবনি আসিম আল-মাযিনী, মুসাইলিমার হাতে শহীদ হন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন এই শ্রেষ্ঠ মায়ের অবদান। তিনি হলেন উম্মু উমারাহ।[২]

আকাবার বাইআত থেকে শুরু করে উহুদ, হুদায়বিয়া, হুনাইন, ইয়ামামাহ'র যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজি ﷺ বলেন, 'আজ (উহুদ-যুদ্ধের দিন) নাসীবাহ বিনতু কাআবের (উম্মু উমারা) অবস্থান অমুক অমুকের চেয়ে উত্তম।' তিনি মুসাইলিমার বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে একটি হাতও হারান।[৩]

۞ খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান

তাঁর মা ছিলেন, আয়েশা বিনতু মুয়াবিয়া। তাঁর ছিল দৃঢ় সংকল্প, সমঝদার অন্তর এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। যেগুলো সাধারণত অনেক পুরুষের মাঝেও থাকে না। ইবনুল কায়েস আবদুল মালিকের সামনে কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে বলেছিলেন—

> '(হে আবদুল মালিক) আপনি আয়েশার সন্তান, যিনি নিজ গোত্রের নারীদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ।
>
> তিনি তাঁর সমবয়সীদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যৌবনের প্রারম্ভে নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছেন।
>
> জন্ম দিয়েছেন আকাশের সূর্যের মতো কল্যাণময়, উজ্জ্বল সন্তান।'[৪]

---

[১] ইবনু আসাকির, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক : ২৯/২৬৫

[২] ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/২৮১, ২৮২। তবে হাফিয ইবনু কাসির তাঁর 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৪১'-এ মুসাইলিমার হন্তারক হিসেবে ওয়াহশী ইবনু হারব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নাম উল্লেখ করেছেন। আর এটাই অধিক বিশুদ্ধ মত। তবে উম্মে উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র উল্লিখিত দুই সন্তানই সে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

[৩] ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/২৭৮-২৮২।

[৪] বালাজুরী, আনসাবুল আশরাফ : ৭/১৯৪। আল-ইকদুল ফরীদ : ২/২১৬। ইমাম যাহাবী, সিয়ারু

খলীফা উমর ইবনু আবদিল আযীয

তাঁকেও অনেক আলিম খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাঁর মা ছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নাতনী–উম্মু আসিম বিনতু আসিম ইবনি উমর ইবনিল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি সমসাময়িক নারীদের মাঝে সর্বদিক থেকেই পূর্ণতার অধিকারী এবং হৃদ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। উম্মু আসিমের মা-কে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলে আসিমের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তিনি উঁচু বংশীয়া ছিলেন না, কিন্তু দুধে পানি মেশানোর ব্যাপারে তাঁর মাকে উপদেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে সততা প্রদর্শন করেছিলেন, তা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুগ্ধ করেছিল। এই উম্মু আসিমই উমর ইবনু আবদিল আযীয রাহিমাহুল্লাহকে তাঁর নানা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র রঙে রাঙিয়ে তুলেছিলেন।[১]

আবদুর রহমান আন-নাসীর

তৃতীয় আবদুর রহমান। আন্দালুস অঞ্চলের শাসক (৯২৯-৯৬১)। তখন আন্দালুসে খুব সমস্যা— উত্তরদিক থেকে খ্রিষ্টানরা আক্রমণ করছে, এদিকে আফ্রিকায় ফাতিমীরা নতুন সাম্রাজ্য দাঁড় করাচ্ছে। ক্ষমতা নিয়ে আভ্যন্তরীণ কোন্দল। বাবাকেই হত্যা করেছে চাচা মুতাররিফ। এমন এক সময়ে তরুণ সুলতান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে সেনাবাহিনী রওনা করেন। এক যুদ্ধে ৭০টি দুর্গ বিজয় করেন। তারপর তিনি ফ্রান্সের রাজধানীর দিকে দৃষ্টি দেন। সুইজারল্যান্ডের ভেতরে প্রবেশ করেন। ইতালির প্রান্ত অবধি পৌঁছে যান। সব শাসকগোষ্ঠী তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। পুরো স্পেন-পর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর ইতালি তাঁর দাপটে প্রকম্পিত। একটানা রাজত্ব করেন ৫০ বছর ছয় মাস। খিলাফতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে যায় কর্ডোভা শহর। ইউরোপের রাজা-বাদশাহরা স্থানীয় শত্রুর বিরুদ্ধে, অন্তর্কোন্দলে তাঁর সাহায্য চাইত। আর কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে আসত পুরো ইউরোপ। স্বনামধন্য উলামায়ে কেরাম এবং বিখ্যাত দার্শনিকরা সেখানে দারস দিতেন।

আবদুর রহমান ছিলেন ইয়াতীম। তাঁর বয়স যখন ২১ দিন তখন তাঁর চাচা

আ'লামিন নুবালা : ৪/২৪৬-২৪৯।

[১] ইমাম যিরিকলী, আল-আলাম : ৩/৩২৪

তাঁর বাবাকে খুন করেছিল। তাঁর মা ছিলেন খ্রিষ্টান দাসী মুযনা। দাদিও ছিলেন খ্রিষ্টান, প্যামপ্লোনার রাজকন্যা। তাহলে বিপর্যস্ত মুসলিম শাসনকে এইভাবে শান-শওকতের চূড়ায় নেবার এই দক্ষতার পেছনে কী জাদু ছিল? সেই জাদুকর ছিলেন তাঁর ফুফু—'সাইয়্যেদা'। আবদুর রহমানের শিক্ষাদীক্ষা ছিল এই ফুফুর যিম্মায়। আর সুলতানের ব্যক্তিত্ব-বীরত্ব-জ্ঞানের কারিগর ছিলেন ইনিই। [১]

সুফিয়ান সাওরী

তিনি একই সাথে আরবের ফকীহ ও হাদীস বিশারদ। এবং তখনকার ছয়টি অনুসরণীয় মাযহাবের একটির প্রণেতা। হাদীস শাস্ত্রে তিনি মুসলমানদের গুরু। তাঁর সম্পর্কে যায়িদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাওরী মুসলিমদের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব।' ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুফিয়ান সাওরীই একমাত্র ব্যক্তি, বিশ্ববাসী বিনা দ্বিধায় যাঁর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।' এই মহামান্য ইমাম এবং তাঁর অগাধ প্রজ্ঞা শুধুমাত্র তাঁর পুণ্যবতী মায়ের অবদান। ইতিহাস আমাদেরকে তাঁর মায়ের নিদর্শন, সম্মান, তাঁর অবস্থান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

ইমাম আবু আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুফিয়ান সাওরীর মা তাঁকে বলেন, "বেটা, তুমি জ্ঞান অর্জন করো। জীবিকার জন্য সুতার মেশিন নিয়ে আমিই যথেষ্ট।"' তিনি দিনমান কাজ করতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য; যাতে সুফিয়ান সাওরী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান।

তিনি তাঁকে নসীহতের মাধ্যমে প্রেরণা যোগাতেন। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, 'একদিন তাঁর মা তাঁকে বলছিলেন, "বেটা, তুমি ১০টি অক্ষর লেখার পর চিন্তা করবে তোমার ভেতরে আল্লাহভীরুতা, সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না। যদি তুমি নিজের ভেতর এটি অনুভব করতে না পারো, তাহলে মনে রেখো এগুলো তোমার ক্ষতি ছাড়া উপকার বয়ে আনবে না।"' [২]

এখন যদি আমরা দেখি সুফিয়ান কীভাবে ইমাম সুফিয়ান সাওরী হয়েছেন,

---

[১] Abd al-Rahman III. - Wikipedia

[২] সিফাতুস সাফওয়া : ৩/১৮৯।

তাহলে এতে অসম্ভবের কিছু নেই। তিনি তো একজন আল্লাহওয়ালীর কোলে বেড়ে উঠেছেন। এমন আল্লাহভীরু, ইলম-প্রেমী, পরিশ্রমী মায়ের সন্তানের তো এমনই হবার কথা।

ইমাম আওযায়ী

এবার আমরা শামের বিখ্যাত ও আস্থাভাজন ইমাম এবং ফিকাহবিশারদ আবু আমর আল-আওযায়ী'র কথাই ধরি। তাঁর ব্যাপারে আবু ইসহাক আল-ফাযারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি দুজন ব্যক্তির মতো কোনো মানুষ এই পৃথিবীতে দেখিনি। আওযায়ী এবং সুফিয়ান সাওরী। আওযায়ী সর্বসাধারণকে নিয়ে থাকেন। আর সাওরী বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে। যদি এই জাতির জন্য তাঁদের দুজন থেকে একজনকে (ইমাম হিসেবে) নির্ধারণ করার স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হতো, তাহলে আমি তাঁদের জন্য আওযায়ীকেই নির্ধারণ করতাম। কারণ, তাঁর জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত। আল্লাহর শপথ, তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন ইমাম ছিলেন। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে আমি কোনো ইমাম খুঁজে পাচ্ছি না। যদি জাতি কোনো বিপাকে পড়ে যেত আর তাঁদের মাঝে আওযায়ী উপস্থিত থাকতেন, তাহলে তারা দৌড়ে তার দিকেই ধাবিত হতো।'

আল্লামা আল-খারীবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইমাম আওযায়ী তাঁর সমসাময়িকদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।' ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কারো ফিকাহ যে হাদীসের সাথে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, আওযায়ী ছাড়া এমন কাউকে আমি কখনো দেখিনি।'[১]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আওযায়ী'র ইমামত, শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও অগাধ সম্মানের কথা উলামায়ে কেরাম একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। এবং তাঁর আল্লাহভীরুতা, দুনিয়াবিমুখতা, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী, সত্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা, বর্ণিত হাদীসের আধিক্য, ফিকাহশাস্ত্রের অগাধ জ্ঞান, সুন্নতে দৃঢ়তা, বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠত্ব, সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় ইমামগণ কর্তৃক সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর কৃতিত্বের বহু দিক পূর্বসূরি আলিমগণ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। এবং এগুলোর ওপর সবাই একমত পোষণ করেছেন।'[২]

---

[১] তাহযীবুত তাহযীব : ৬/২৩৮-২৪২

[২] তাহযীবুল আসমাই ওয়াল লুগাত, ১/২২৯

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইমাম আওযায়ী'র ব্যাপারে আমার বাবা যতবেশি বিচলিত হতেন, দুনিয়ার কোনো বিষয়েই এত বেশি বিচলিত হতেন না। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ, আপনি বড়ই মহান। যা আপনার ইচ্ছা হয়, তাই করেন। মায়ের কোলে এতিম হতদরিদ্র শিশু ছিলেন আওযায়ী। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াতে। তাঁর ব্যাপারে আপনার কী অনিন্দ্য সিদ্ধান্ত! তাঁকে পৌঁছে দিয়েছেন এমন স্থানে যা এখন আমাদের চোখের সামনে।

'হে আমার বৎস, রাজা-বাদশারা পর্যন্ত নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানাদিকে ইমাম আওযায়ীর আদর্শে আদর্শবান করতে সক্ষম হয়নি। আমি কখনও তাঁর মুখ দিয়ে অযথা বাক্য নিঃসৃত হতে শুনিনি। তিনি যা কিছু বলেছেন, শ্রোতারা তা দৃঢ়ভাবে নিতে বাধ্য হয়েছে। আমি কখনও তাঁকে উচ্চস্বরে হাসতে দেখিনি। তিনি যখন পরকালের আলোচনায় মগ্ন হতেন আমি নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করতাম—এই মজলিসে এমন কোনো হৃদয় আছে, যে অশ্রু প্রবাহিত করছে না?'"'[১]

পাঠক, দেখুন, মায়ের একক প্রচেষ্টায় সন্তান পৃথিবীতে কেমনভাবে বরিত হতে পারে!

ইমাম রবীআ

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ'র উসতায ইমাম 'রবীআতুর রায়'-এর মায়ের গল্প শোনাই এবার। আল্লাহর এই বান্দীর স্বামী ছিলেন তাবেয়ী ফাররুখ রাহিমাহুল্লাহ। জিহাদে যাবার সময় সারাজীবনের সঞ্চয় ৩০ হাজার দীনার স্ত্রীর কাছে রেখে গিয়েছিলেন, আর বলে গিয়েছিলেন—'এগুলোর উত্তম সদ্ব্যবহার কোরো। আল্লাহর বান্দী সেই পুরো দীনার সন্তান রবীআ'র শিক্ষাদীক্ষার পেছনে খরচ করেছেন। ২৭ বছর পর ফিরে এলেন স্বামী ফাররুখ। এসে দেখেন যুবক রবীআ'র ইলমের ছটায় পুরো মদীনা আলোকিত। সারা দুনিয়া তাঁকে চেনে 'ইমাম রবীআতুর রায়' নামে।

ইবনু খাল্লিকান তাঁর বিস্তারিত ঘটনাটি এভাবে বলেন, 'বনু উমায়্যাহ'র

[১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/২২৯

শাসনামলে রবীআ'র পিতা ফাররুখ খুরাসান অঞ্চলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। তখন রবীআহ তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন। তিনি যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রবীআহ'র মাকে ৩০ হাজার দীনার দিয়ে যান। তারপর ২৭ বছর পর তিনি বল্লম হাতে অশ্বারোহী হয়ে মদীনায় ফেরেন। দরজায় বল্লম দিয়ে করাঘাত করেন। ভেতর থেকে রবীআ বেরিয়ে আসেন। এবং বলেন, "আল্লাহর দুশমন, তুমি আমার বাড়িতে হানা দিয়েছ?" 'ফাররুখ বলেন, "হে আল্লাহর দুশমন, তুমি আমার সংরক্ষিত জায়গায় প্রবেশ করেছ?" তাঁরা পরস্পরে ঝগড়ায় জড়িয়ে যান। ইতিমধ্যে পাড়া-প্রতিবেশী জড়ো হয়ে গেল। এ-সংবাদ ইমাম মালিক ইবনু আনাস রাহিমাহুল্লাহ'র কান অবধি পৌঁছে। তিনি সাথে কয়েকজনকে নিয়ে রবীআ'র সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। (বাপ-বেটা) উভয়েই বলছেন—"আমি তোমাকে ছাড়বো না।"

'তাঁরা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহকে দেখে খানিকটা শান্ত হলেন। তিনি বৃদ্ধ মুজাহিদকে লক্ষ করে বললেন, "মুরব্বি, এ-বাড়ি ছাড়াও আপনি অন্য কোনো বাড়িতে উঠতে পারেন।" বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন, "এটি আমার বাড়ি। আর আমি হলাম ফাররুখ।" ভেতর থেকে তাঁর স্ত্রী তাঁর কথা শুনে বেরিয়ে এলেন। এবং বললেন, "তিনি আমার স্বামী। আর এ হচ্ছে আমার ছেলে। আমার গর্ভাবস্থায় তিনি তাকে রেখে চলে গিয়েছিলেন।"

'তারপর বাপ-বেটা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ফাররুখ বাড়িতে প্রবেশ করলেন। এক সময় তিনি স্ত্রীর কাছে সেই দীনারগুলোর খোঁজ নিলেন—'যে সম্পদ আমি তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো কোথায়?' স্ত্রী আকারে ইঙ্গিতে বললেন, "আছে রাখা, পরে বের করছি।"

'তারপর রবীআ রাহিমাহুল্লাহ মসজিদে গিয়ে তাঁর মজলিসে বসেন। ইমাম মালিক, ইমাম হাসান-সহ মদীনার আরও গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর মজলিসে এসে উপস্থিত হন। রবীআ'র মা স্বামী ফাররুখকে বলেন, 'নবী কারীম ﷺ-এর মসজিদ থেকে নামায পড়ে আসুন।' তিনি মসজিদে এসে বিশাল এক মজলিস দেখে মজলিসের কাছে এসে দাঁড়ান। এদিকে রবীআ তাঁর বাবার চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য মাথাটা সামান্য নুইয়ে রাখেন। আর তাঁর মাথায় লম্বা একটা টুপি থাকার কারণে বাবা তাঁকে পুরোপুরি চিনতে পারেননি।

'বাবা তখন আশপাশে জিজ্ঞেস করলেন, "এই লোকটি কে?" তাঁকে বলা হলো, "তিনি হচ্ছেন রবীআ ইবনু আবি আবদির রহমান।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা আমার ছেলেকে এত মর্যাদা দান করেছেন!" বাড়ি গিয়ে রবীআ'র মাকে বললেন, "আমি তোমার ছেলেকে এমন অবস্থানে দেখে এলাম যে অবস্থানে আমি অন্য কোনো আলিম ও ফকীহকে দেখিনি।" তখন তাঁর মা বললেন, "আপনার কাছে কোনটি বেশি পছন্দনীয়, ৩০ হাজার দীনার নাকি এই ছেলের অবস্থান?" তিনি বললেন, "না। আল্লাহর কসম, এই ছেলেই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।" তিনি বললেন, "আমি সব সম্পদ এই ছেলের পেছনে ব্যয় করেছি।" তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, তুমি আমার সম্পদ নষ্ট করোনি।" [১]

উম্মু ইবরাহীম আল-বাসরিয়্যাহ, আল-আবিদাহ

বর্ণিত আছে, বসরা অঞ্চলে ইবাদাতগুজার অনেক নারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উম্মু ইবরাহীম আল-হাশিমিয়্যাহ। একদিন মুসলিম সীমান্ত-ছাউনিতে হানা দেয় শত্রুরা। লোকজনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যাইদ আল-বাসরী রাহিমাহুল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিতে দাঁড়ান। তিনি সবাইকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছিলেন। উম্মু ইবরাহীমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল ওয়াহিদ দীর্ঘ বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্যে তিনি জান্নাতের ডাগর চোখের অপ্সরাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত বাণীগুলো উল্লেখ করছেন। তাদের গুণকীর্তনে তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন—

প্রণয়ের আহ্বানে মিলনের প্রহর গোণে প্রফুল্ল তরুণীর দল,
চকিত দৃষ্টিতে কামনার সবটুকু খুঁজে পাবে প্রত্যাশী দল।
স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের পসরা বসেছে আমাদেরই রূপে গুণে,
ক্লেদ, কষ্ট, মলিনতা সব ছুড়ে ফেলে গুনে গুনে।
অপার মহিমাময় রবের হুকুমে আমাদের এ অপরূপ কায়া,
রূপ, লাবণ্য, কোমল স্বভাব, বুকভরা শুধু মায়া।
কাজল কালো ডাগর চোখে যাদুমাখা আহ্বান,

[১] মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান, মিন আখলাকিল উলামা : ১৫৩, ১৫৪।

কপোলের ঘামে মুক্তো ঝরে, যেন আগরের সুঘ্রাণ।
কোমল, পেলব, মসৃণ দেহের অনিন্দ্য এক গড়ন,
শাহী আভিজাত্য আর প্রফুল্লচিত্তের অনন্য সম্মিলন!
শুনতে কি পাও নিক্কন ধ্বনির সে সুর লহরী?
নিক্কনে-কাঁকনে যার শিখা ছড়ায়, ধরা দেয় মাধুরী।
সুবাসিত পল্লব বেষ্টিত মনকাড়া উদ্যানে করি বিচরণ,
বহুদূরে যার সুবাস ছড়ায় মৃদু সমীরণ।
আহ্বানে যার ছড়িয়ে আছে নিখাদ প্রেমের আবেদন,
পূর্ণ কামনা উপচে দিয়ে করে বিনীত নিবেদন।
কোথা হায় প্রিয়তম! তাকে ছাড়া কিছুতেই বসে না এ মন,
তুমিহীনা এ আমি যেন কুঁড়িতেই শেষের দহন!
সময়ের দাবি ফুরিয়ে এলে, অসময় করে ফের এসো না,
জানোই তো জান, সময় গেলে আর যে সাধন হয় না!
প্রেমিক! তুমি ভুলোমনা হয়ে ফের খুইয়ে বসো না,
জেদি প্রেমিকের মতো হৃদয়ে ধারণ করো তীব্র বাসনা।[১]

বর্ণনাকারী বলেন, 'কবিতা আবৃত্তি শুনে উপস্থিত জনতার হৃদয়ে ঢেউ খেলে গেল। মজলিসে সৃষ্টি হলো আলোড়ন।' লোকজনের ভেতর থেকে উম্মু ইবরাহীম হন্তদন্ত হয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, 'হে আবু উবাইদ, আপনি আমার ছেলে ইবরাহীমকে চেনেন না? বসরা অঞ্চলের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিবর্গ তার সাথে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আসেন। আল্লাহর শপথ, এই জান্নাতী মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। তাঁকে আমি আমার পুত্রবধূ হিসেবে পেতে চাই। আপনি তার সৌন্দর্য আর অঙ্গসৌষ্ঠবের কথাগুলো আরেকবার বলুন!'

আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ আবার জান্নাতী অপ্সরার গুণকীর্তন শুরু করলেন—

চেহারার নূরে তার নূরের ফোয়ারা ছোটে

[১] কবিতার অনুবাদ হুবহু নয়। তবে সিংহভাগ ঠিক রেখে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

খুশবুতে তার মাতোয়ারা হয়ে সুবাসিত ফুল ফোটে।
নিষ্প্রাণ নুড়িপাথরে তার উচ্ছল পদচারণায়,
সৃষ্টির উল্লাসে জাগে তৃণ জলের ফোঁটায় ফোঁটায়।
তার সঞ্জীবনী কোমর বন্ধনীর উপমায়
এঁকে দিতে পারো তা রাইহানের সবুজাভ শাখায়।
সাগরের নোনা জলও তার মিষ্টি লালার ছোঁয়ায়,
বনে যেতে পারে সুবিশাল মিষ্ট জলধারায়।
তার কপোলের আলতো ছোঁয়ার আবেশ,
হৃদয়ে তার কামনা জাগায়, বাকি সব যেন নিঃশেষ।[১]

কবিতা শুনে উপস্থিত জনতার মাঝে আগের চেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হলো। উম্মু ইবরাহীম আবার তটস্থ হয়ে আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহকে বললেন, 'হে আবু উবাইদ, আল্লাহর শপথ! এই মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। আমি তাকে পুত্রবধূ হিসেবে পেতে চাই। আপনি কি এই মুহূর্তে তার সাথে আমার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন? বিয়ের মোহরানা বাবদ আপনি আমার থেকে ১০ হাজার দীনার এই মুহূর্তে নিয়ে নিন। আর আমার ছেলে ইবরাহীম কাল-বিলম্ব না করে আপনার সাথে এখনই জিহাদে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাকে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। সে আমার এবং তার বাবার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করতে পারবে না?'

আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যদি আপনি এটি করতে পারেন তাহলে তো আপনি, আপনার স্বামী এবং আপনার সন্তান সকলেই নিশ্চিত সফলতার মুখ দেখতে পাবেন।' তারপর তিনি তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে ডাক দিলেন। ইবরাহীম মজলিসের ভেতর থেকে হন্তদন্ত হয়ে উঠে এলেন। এবং বললেন, 'মা, আমি হাজির।' তিনি বললেন, 'আমার প্রিয় ছেলে, তুমি কী আল্লাহর রাস্তায় তোমার জীবন কুরবানী করে এই মেয়েকে পত্নী হিসেবে পেতে আগ্রহী?' ছেলে বললেন, 'হ্যাঁ মা, আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি আগ্রহী।'

তারপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি। আমি

[১] কবিতার অনুবাদ হুবহু নয়। তবে সিংহভাগ ঠিক রেখে ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

আমার ছেলেকে আপনার পথে তার জীবন কুরবানী করার মাধ্যমে এবং তার আন্তরিক তাওবার মাধ্যমে এই জান্নাতী মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হে দয়াময় আল্লাহ, আপনি আমার পক্ষ থেকে তাকে কবুল করে নিন।'

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি সেখান থেকে চলে যান। ১০ হাজার দীনার নিয়ে আবার ফিরে আসেন এবং আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহকে লক্ষ করে বলেন, 'হে আবু উবাইদ, এই নিন ১০ হাজার দীনার। আপনি তার বিয়ের ব্যবস্থা করুন। এবং আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জিহাদের পূর্ণ তোড়জোড় চালিয়ে যান।' অতঃপর তিনি সেখান থেকে ফিরে গিয়ে ছেলের জন্য একটি উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করেন এবং উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করে দেন। আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলেন, ইবরাহীমও তাঁর সাথে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে রওনা হন। তাঁর পাশেই কারী সাহেব কুরআন থেকে তিলাওয়াত করছিলেন —

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

> *'আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে জান্নাত দেওয়ার বিনিময়ে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।'*[১]

বর্ণনাকারী বলেন, ছেলের বিদায়লগ্নে তাঁর মা তাঁকে কাফনের কাপড় আর সুগন্ধি দিয়ে বললেন, 'প্রিয় বেটা, যখন তুমি যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের মুখোমুখি হবে তখন এই কাফনের কাপড় গায়ে জড়িয়ে তাতে সুগন্ধি মাখিয়ে নেবে। আর অবশ্যই যেন আল্লাহ তাআলা তোমাকে একজন তুখোড় যোদ্ধা হিসেবেই দেখেন।' তারপর তিনি ছেলেকে আলিঙ্গন করে কপালে চুমু এঁকে দিলেন। এবং বললেন, 'প্রিয় বেটা, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে হাশরের ময়দানে তাঁর সামনে সাক্ষাৎ করান।'

আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তারপর আমরা শত্রুদের দেশে গিয়ে পৌঁছলাম। বীর যোদ্ধাদেরকে আহ্বান করা হলো। মানুষ যুদ্ধের জন্য দলে দলে সামনে এগুতে থাকল। ইবরাহীম প্রথম সারির সৈনিক ছিল। অনেক শত্রুকে সে হত্যা করে। এক সময় শত্রুরা তাকে ঘিরে ফেলে। এবং সে শহীদ হয়ে যায়।'

---

[১] সূরা তাওবাহ, আয়াত-ক্রম : ১১১

আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তারপর আমরা বসরা অঞ্চলে ফিরে আসার সময় আমি আমার সঙ্গীদেরকে বললাম, "সর্বোত্তম সান্ত্বনা হিসেবে ইবরাহীম নিজেই তাঁর মায়ের সাথে সাক্ষাৎ না করা অবধি তোমরা কেউ উম্মু ইবরাহীমকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেবে না। যাতে তিনি অস্থির না হন। আর তাঁর সকল সওয়াব বিফলে না যায়।" আমরা বসরা অঞ্চলে পৌঁছার পর মানুষজন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এল। উম্মু ইবরাহীমও তাদের সাথে এসেছিলেন।'আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি আমাকে বললেন, "হে আবু উবাইদ, আমার পক্ষ থেকে সামান্য উপহার কি কবুল করা হয়েছে? আমি সুসংবাদপ্রাপ্ত, নাকি প্রত্যাখ্যাত?" আমি তাঁকে বললাম, "আপনার উপহার কবুল করা হয়েছে। ইবরাহীম এখন জীবিতদের সাথে আছে। তাঁকে সর্বোত্তম রিযিক দেওয়া হচ্ছে।"বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। এবং বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি আমার আশাভঙ্গ করেননি। আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত উপহার তিনি গ্রহণ করেছেন।' একথাটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা উম্মু ইবরাহীম এলেন আবদুল ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহ'র মসজিদে। সালাম জানিয়ে তাঁকে বললেন, 'আবু উবাইদ, আপনার জন্য সুসংবাদ।' আবদুল ওয়াহিদ বললেন, 'সর্বদাই আপনি কল্যাণের সুসংবাদপ্রাপ্ত হোন, হে উম্মু ইবরাহীম!' উম্মু ইবরাহীম বললেন, 'গতরাতে আমি আমার ছেলে ইবরাহীমকে স্বপ্নে দেখি। সে সুন্দর মনোরম একটি বাগানে অবস্থান করছে। সেখানে একটি সবুজ রঙের গম্বুজ আছে। মণি-মুক্তার আসনে সে বসা। সে মাথায় মুকুট আর গলায় হার পরিহিত। সে বলল, "আম্মাজান! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মোহরানা কবুল হয়েছে। ইতিমধ্যে আমার বাসরও সম্পন্ন হয়েছে।' [১]

মা সম্পর্কে জনৈক কবি সত্য কথাই বলেছেন—

মা হলেন এক পাঠশালা, গড়তে যদি পারো,
গড়বে তুমি দূর আগামী, তোমার ঘরের আলো।
মা হলেন এক সুফলা বাগান, বুনবে তাতে যা,

---

[১] ইমাম নাহহাস, মাসীরুল গরাম ইলা দারিস সালাম, পৃষ্ঠা-ক্রম : ২৬-২৯

মা মহাপুরুষ তৈরির নির্মাণশিল্পী

হালকা সেঁচেই চলবে বেড়ে ফুল-ফল আর পাতা।
সকল গুরুর প্রথম গুরু, মা জননী জেনো,
সাফল্যের ওই দূর-দিগন্ত তার ছায়াতেই যেন। [১]

আমরা পূর্বসূরী পুণ্যবান মনীষীদের ইতিহাস পড়ে তাদের কষ্ট-ক্লেশ, জ্ঞান অর্জন, ইবাদাত-বন্দেগী, দুনিয়াবিমুখতা এবং আকাশছোঁয়া মনোবল দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যাই। কিন্তু আমি (মাহমুদ আল-মিসরী) আপনাদেরকে সুস্পষ্টভাবে একটা কথা বলতে চাই। প্রকৃতপক্ষে এখানে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, তাঁরা এমন নারীদের জঠরে জন্মেছেন, এমন পবিত্র নারীদের দুধপান করেছেন, এমন নিষ্ঠাবান নারীদের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছেন, যাঁরা নিজেরাই ছিলেন আল্লাহর ওলী। তাঁরা নিজেরাই একেক জাতির সমতুল্য ছিলেন। তাহলে কেন তাদের সন্তানাদি এমন হবেন না? কেন আমগাছে আম-ই ফলবে না? আল্লাহর ওলীদের গর্ভ থেকে আল্লাহর ওলী বের হবেন, এ আর আশ্চর্যের কী! আর বেহায়া নারীর গর্ভে বেহায়া পাপাচারীই পয়দা হবে। এবার বুঝা গেছে উম্মাহর অসুখ?

[১] মুহাম্মাদ ইসমাঈল আল মুকাদ্দাম, আওদাতুল হিযাব, ২/২১২

পূর্বসূরি পুণ্যবতী নারীদের দৃষ্টান্ত

বিবাহের পাত্রী খোঁজার সময় মুসলিম যুবকদের সামনে আগের যুগের পুণ্যবতী নারীদের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠা দরকার। আফসোস, যে জাতির যুবকেরা পাত্রী খোঁজার কথা উঠলেই নির্লজ্জ দেশী-বিদেশী অভিনেত্রীদের স্বপ্ন দেখে, সে জাতি কী করে ইতিহাস-বদলে-দেয়া সন্তান আশা করে? বরং উচিত তো ছিল 'পাত্রী' শব্দটি শুনলেই মনে ভেসে উঠবে আমাদের অতীতের ইবাদাতগুজার, দ্বীনপ্রাণ, দুনিয়াবিমুখ নারী সাহাবীগণের জীবনচরিত। ভেসে উঠবে সর্বোত্তম নারী 'উম্মাতের আম্মাজান'-গণের পূতপবিত্র গুণাবলি। শুধু ভাইয়েরাই নয়, বোনদের উচিত বেশি বেশি নবীজির সম্মানিত স্ত্রীগণ এবং নারী সাহাবী-তাবেয়ীন এবং আল্লাহওয়ালা মনীষীদের মায়েদের জীবনীগুলো বেশি বেশি চর্চা করা। তাঁদেরকে নিজের জীবনের মডেল হিসেবে গ্রহণ করা। চলুন, নতুনভাবে এক নজরে দেখি তাঁদেরকে।

۞ উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ﵂

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আয়েশা (খালা) ও আসমা (মা) রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র মতো দানশীলা নারী আর দেখিনি। দুজনের স্বভাব ছিল আলাদা আলাদা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পদ জমাতেন। জমিয়ে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। আর আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আগামীকালের জন্য কিছুই জমিয়ে রাখতেন না (হাতে আসামাত্র দান করে দিতেন)।'[১]

কাসিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়েশা ﵂ সারাবছরই রোজা রাখতেন। শুধু দুই ঈদের দিন বাদ দিতেন।'[২]

---

[১] ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা, পৃষ্ঠা-ক্রম : ১২৫

[২] ইবনু সাআদ, তাবাকাতুল কুবরা : ৮/৪৭

উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়েশা ﵂ (খালা) সবসময় রোযা রাখতেন।'[১] কাসিম রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'আমি প্রতিদিন ভোরে আয়েশা ﵂-এর বাড়িতে যেতাম এবং তাঁকে সালাম দিয়ে আসতাম। একদিন গিয়ে দেখি তিনি নামাযের মধ্যে পড়ছেন—

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ۝

> *"অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।"*[২]

ছোট্ট আয়াতটিই তিনি বারবার পড়ছেন। আর অঝোরে কাঁদছেন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আর পারলাম না, চলে এলাম। বাজারে আমার প্রয়োজনীয় কাজ ছিল। কাজটাজ সেরে ফিরে আসার পথে দেখি—তিনি তখনও নামাযে দাঁড়িয়ে আগের মতোই কাঁদছেন।'[৩]

উম্মু জাররাহ সবসময় আম্মাজান আয়েশা ﵂-এর সাহচর্যে থাকতেন। তাঁর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির বর্ণনা করেন, 'একদিন ইবনুয যুবাইর আয়েশা ﵂-এর কাছে দুই ব্যাগ মালামাল পাঠালেন। আনুমানিক এক লক্ষ ৮০ হাজার দিরহাম হবে। আয়েশা ﵂ একটি বাটি আনতে বললেন। তিনি সেদিন রোযাদার ছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে সব মালামাল মানুষের মাঝে বণ্টন করতে থাকলেন। সন্ধ্যা অবধি বণ্টনের পর তাঁর কাছে আর একটি দিরহামও অবশিষ্ট রইল না। সন্ধ্যাবেলা তিনি বললেন, "আমাকে ইফতার দাও।" দাসী যাইতুনের তেল আর শুকনো রুটি নিয়ে এল। উম্মু জাররাহ তখন তাঁকে বললেন, "যে সম্পদগুলো আজকে আপনি লোকজনের মাঝে ভাগ-বণ্টন করে দিলেন, সেখান থেকে আমাদের জন্য দু-এক দিরহাম দিয়ে সামান্য গোশতেরও তো ব্যবস্থা করতে পারতেন! তাহলে আমরা এখন গোশত দিয়ে ইফতার করতে পারতাম।" উত্তরে তিনি বললেন, "এখন এগুলো বলে কোনো লাভ নেই। তখন যদি তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে তাহলে চেষ্টা করে দেখতাম।"'[৪]

---

[১] আবু আহমাদ তাবারী, আস-সামতুস সামীন, পৃষ্ঠা-ক্রম : ৯০

[২] সূরা তূর, আয়াত-ক্রম : ২৭

[৩] আবু আহমাদ তাবারী, আস-সামতুস সামীন, পৃষ্ঠা-ক্রম : ৯০

[৪] ইবনু সাআদ—তাবাকাতুল কুবরা—৮/৪৬; আবু নুআইম—হিলয়াতুল আওলিয়া—২/৪৭

উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর বলেন, 'আয়েশা ﵂-এর কাছে আল্লাহ-প্রদত্ত যে জীবিকাই আসত তিনি সেগুলো নিজের কাছে না রেখে দান করে দিতেন।'[১]

তিনি বলেন, 'একবার মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা ﵂-এর কাছে এক লক্ষ দিরহাম উপহারস্বরূপ পাঠালেন। তিনি সেগুলো লোকজনের মাঝে ভাগ-বণ্টন করে দিলেন। নিজের কাছে কানাকড়িও রাখেননি। তখন বারিরাহ ﵂ বললেন, "আপনি তো আজকে রোযাদার। আপনি কী নিজের জন্য দু-এক দিরহাম দিয়ে গোশতের ব্যবস্থা করতে পারতেন না?" তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, "যদি তুমি আমাকে তখন মনে করিয়ে দিতে তাহলে চেষ্টা করে দেখতাম।"'[২]

উরওয়াহ আরও বর্ণনা করেন, 'একবার আয়েশা ﵂ ৭০ হাজার দিরহাম দান করে দিলেন। অথচ তিনি তাঁর কাপড়ের এক পার্শ্বে জোড়াতালি দিয়ে রেখেছেন।'[৩]

আবদুল্লাহ ইবনু আবি মুলাইকাহ রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি একবার (ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে) আম্মাজান আয়েশা ﵂-এর কাছে এলেন। আয়েশা তখন অসুস্থ, তাঁর শিথানে ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান বসা ছিলেন।

ইবনু আবি মুলাইকা বললেন, 'ইবনু আব্বাস ভেতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন।' ভাতিজা আবদুল্লাহ ফুপুর দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দেখে বললেন, 'ফুপু তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।' আয়েশা ﵂ তখন জেগে গিয়ে বললেন, 'ইবনু আব্বাস আবার কে?' ভাতিজা বললেন, 'প্রিয় মা, ইবনু আব্বাস হচ্ছেন আপনার একজন পুণ্যবান সন্তান। তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। এবং আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছেন।'

আম্মাজান বললেন, 'তাহলে তাঁকে আসার অনুমতি দিতে পারো।' অনুমতি পেয়ে ইবনু আব্বাস ভেতরে ঢুকলেন, আম্মাজানের কাছে বসে বললেন, 'উম্মুল মুমিনীন! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার আত্মা দেহত্যাগ করার পরপরই তো আপনি নবী কারীম ﷺ ও আপনার প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। নবী কারীম ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে আপনি ছিলেন তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর

---

[১] আবু আহমাদ তাবারী—আস-সামতুস সামীন—৮৮

[২] আবু নুআইম—হিলয়াতুল আওলিইয়া—২/৪৭; মুসতাদরাকু হাকিম—৪/১৫ [৬৭৪৫]

[৩] ইবনু সাআদ—তাবাকাতুল কুবরা—৮/৪৫

নবীজি তো সর্বোত্তমকেই সবসময় ভালোবাসতেন।

'লাইলাতুল-আবওয়াতে যখন আপনার গলার হার হারিয়ে গেল, সেখানে আপনি রাসূল ﷺ-এর সাথেই ছিলেন। এত এত মানুষ, কারো কাছে সামান্য পরিমাণ পানিও ছিল না। আল্লাহ তাআলা সেখানে তায়াম্মুমের বিধান পাঠালেন। তিনি বললেন —

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

> *"তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।"*[১]

'এই উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলা মাটি ব্যবহারের যে সুবিধা দিলেন, সেটি একমাত্র আপনারই কারণে। আপনার সতিত্বের প্রমাণ হিসেবে সপ্তম আকাশ থেকে রুহুল আমীন (জিবরাঈল) আয়াত নিয়ে এসেছেন। এখন পৃথিবীতে যত মসজিদ আছে, যেখানে আল্লাহ তাআলার যিকির করা হয়—সব জায়গায় সকাল-সন্ধ্যা এগুলো তিলাওয়াত হচ্ছে।'

আয়েশা ﷺ বললেন, 'ইবনু আব্বাস, এগুলো বাদ দাও তো। তোমার এই পবিত্রতার গুণকীর্তন থেকে আমাকে মুক্তি দাও। আল্লাহর শপথ, আমার আকাঙ্ক্ষা—যদি আমি এগুলো সব ভুলে যেতাম।'[২]

۞ আসমা বিনতু আবি বকর ﷺ

উম্মু আবদিল্লাহ আল-কুরাইশিয়্যাহ আত-তাইমিয়্যাহ। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সম্মানিত মাতা এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ﷺ-এর বোন ছিলেন। যাতুন নিতাকাইন (দুই ফিতাওয়ালী) নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন সবার কাছে, নিজ ওড়না দুটুকরো করে নবীজি ﷺ ও আবু বকর ﷺ-এর জন্য হিজরতের সামান বেঁধে দিয়েছিলেন বলে এই উপাধি লাভ করেছিলেন। মুহাজির নারী-পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

ইবনু আবি মুলাইকাহ বলেন, 'আসমা ﷺ-এর মাথাব্যথার রোগ ছিল। মাঝে

---

[১] সূরা-মায়িদাহ, আয়াত-ক্রম : ৬

[২] ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা, পৃষ্ঠা-ক্রম ১২৫, ১২৬

মাঝে তিনি মাথায় হাত রেখে বলতেন, “হায়, আমার কত গুনাহ! অবশ্য আল্লাহ তাআলা (পাহাড়সম) গুনাহও ক্ষমা করেন।”’[১]

ফাতিমা বিনতু আল-মুনজির বলেন, ‘আসমা ﷺ একবার রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর সকল দাস-দাসী আযাদ করে দিয়েছিলেন।’

মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির বলেন, ‘আসমা ﷺ ছিলেন একজন দানশীলা নারী।’[২]

রুকাইন ইবনুর রাবী বলেন, ‘আমি আসমা বিনতু আবি বকরের বার্ধক্যকালে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি এই বয়সেও অত্যধিক নফল নামায পড়ছেন।’[৩]

উম্মুল মুমিনীন হাফসা ﷺ

মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি নবী কারীম ﷺ-এর কাছে আয়েশা ﷺ-এর সমপর্যায়ের ছিলেন। তিনি পরহেযগার এবং কৃতজ্ঞতাপরায়ণ নারী ছিলেন। ছিলেন পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র মতোই স্পষ্টভাষী এবং ক্ষেত্রবিশেষে চটজলদি কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভ্যস্ত। তাঁর এই স্বভাবজাত আভিজাত্যের দরুন একবার তাঁর প্রতি অভিমান করে রাসূল ﷺ সতর্কতামূলক তাঁকে এক তালাকে রজঈ প্রদান করেন। পরে জিবরীলে আমীনের অনুরোধে নবীজি তা ফিরিয়ে নিয়ে তাঁকে আবার আপন সম্মানে সমাসীন করেন।[৪] একবার ভেবে দেখুন! স্বয়ং জিবরাঈল তাঁর ব্যাপারে সুপারিশ করতে চলে এসেছেন!

জিবরীলে আমীন তাঁর গুণকীর্তন করে বলেন, ‘তিনি রোযাদার, নামাযী নারী। তিনিই হবেন আপনার জান্নাতের সঙ্গিনী।’[৫] তাহলে হাফসা বিনতু ফারুকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এবং জিবরীলে আমীনের প্রশংসা-বাণীর চেয়ে দামি আর কী হতে পারে!

[১] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—২/২৯০

[২] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—২/২৯২

[৩] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—২/২৯৫

[৪] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২২৮৩, অধ্যায় : তালাক। সনদ সহীহ। তাফসীরু ইবনি কাসীর—৮/১৮-১৮৫। সূরা তাহরীম আয়াত-ক্রম : ১-৫-এর ব্যাখ্যায় বিস্তারিত রয়েছে।

[৫] মুসতাদরাকু হাকিম—৪/১৬ [৬৭৫৩]; তাবারানী—আল মুজামুল কাবীর—১৮/৩৬৫ [৯৩৪]; ইমাম যাহাবীর মতে হাদীসটি হাসান।

✿ উম্মুল মুমিনীন যাইনাব বিনতু জাহাশ ﵂

উম্মুল মুমিনীন যাইনাব বিনতু জাহাশ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফাতো বোন। খুব পরিশ্রমী নারী ছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-সাদাকাহ করতেন নিজে উপার্জন করে করে।' [১]

তিনি উম্মুল মাসাকীন (দরিদ্রদের মা) নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আম্মাজান আয়েশা ﵂ বলেছিলেন, 'আজ আমাদের থেকে বিদায় নিলেন ইবাদাতগুজার এক মহৎপ্রাণ নারী; যিনি ছিলেন বিধবা ও নিরাশ্রয় মানুষের আশ্রয়।' [২]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী কারীম ﷺ একবার মদীনার মসজিদে দুই খুঁটির মাঝে ঝুলন্ত একটি রশি দেখতে পেয়ে বললেন, "এই রশিটি কীসের?" উপস্থিত লোকেরা জানালেন, "এটি আম্মাজান যাইনাবের রশি। (নামায পড়তে পড়তে) তিনি ক্লান্ত হয়ে গেলে এটি দিয়ে নিজেকে বেঁধে নেন।" নবী কারীম ﷺ বললেন, "না না। এটা অনুচিত। খুলে ফেলো এটা। যে-কেউ, প্রফুল্লতা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ নামায পড়বে। ক্লান্ত হয়ে গেলে বিরত হবে।"' [৩]

মুহাম্মাদ ইবনু কাব বলেন, 'আম্মাজান যাইনাব ﵂-এর কাছে একবার (রাষ্ট্রীয়) ভাতা-বাবদ ১২ হাজার দিরহাম এসে পৌঁছুল। তিনি সেগুলো নিজ আত্মীয়-স্বজন ও অভাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। একসময় সবগুলোই ফুরিয়ে এল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ-খবর পেয়ে বললেন, "তিনি এমন একজন নারী, যাঁর থেকে সর্বদা কল্যাণের আশা রাখা যায়।' অতঃপর তিনি যাইনাব ﵂-এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সালাম বিনিময়ের পর বললেন, "আপনি সবকিছু দান করে দিয়েছেন, এ-সংবাদ আমি পেয়েছি।" উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনার পর আবার তাঁর কাছে এক-হাজার দিরহাম তাঁর নিজের খরচের জন্য পাঠালেন। এবারও তিনি আগের কাণ্ডই ঘটালেন।' [৪] অর্থাৎ অভাবী-দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।

---

[১] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—২/২১৭
[২] ইবনু হাজার আসকালানী—আল-ইসাবাহ—৭/৬৭০
[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১১৫০, অধ্যায় : জুমুআ
[৪] ইবনু হাজার আসকালানী—আল-ইসাবাহ—৭/৬৭০

বারারাহ বিনতু রাফি'র সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু রাফি বর্ণনা করেন, একবার যাইনাব ﷺ-এর কাছে তাঁর নির্ধারিত ভাতা পৌঁছে দেওয়ার সময় হলে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্ধারিত অংশ তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন। ভাতার মালামাল পৌঁছার পর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা উমরকে ক্ষমা করুন। আমার অন্যান্য বোনেরা আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে।'

উপস্থিত মহিলারা বললেন, 'এগুলো সব আপনার।' তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ!' তারপর সেগুলো একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। বারারাহ বলেন, 'তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এর ভেতরে হাত ঢোকাও। সেখান থেকে এক মুষ্ঠি করে নিয়ে অমুক অমুকের কাছে যাও।" তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয় এবং আশ্রয়হীন মানুষ।'

ভাগ-বণ্টন শেষে কিয়দাংশ অবশিষ্ট রইল। বারারাহ তাঁকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর শপথ, এখানে আমাদেরও কিন্তু অংশ আছে।' তিনি বললেন, 'তাহলে কাপড়ের নিচে বাকি যা আছে, তোমরা নিয়ে নাও।' বারারাহ বলেন, 'আমরা সেখানে ৮৫ দিরহাম পেলাম। সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে তিনি দুআ করলেন—"হে আল্লাহ, আগামী বছর যেন উমরের ভাতা দেখার জন্য আমাকে আর বেঁচে থাকতে না হয়।"'

বারারাহ বলেন, 'ওই বছরই তিনি ইন্তিকাল করেন।'[১]

বর্ণিত আছে যাইনাব ﷺ মুমূর্ষু অবস্থায় বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু আমার কাফনের কাপড় প্রস্তুত করেই রেখেছি। উমর কাফনের কাপড় পাঠাতে পারেন। যদি পাঠান, তাহলে তোমরা দুটোর একটা দান করে দিয়ো। আমাকে কবরে নামানোর সময় যদি আমার কোমরের কাপড়টুকুও দান করা সম্ভব হয়, তাহলে সেটিও দান করে দিয়ো।'[২]

তিনিই সেই নারী নবী কারীম ﷺ যাঁর সম্পর্কে ওফাতের সময় বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার হাত বেশি লম্বা, সে সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।'[৩] নবীজি 'লম্বা হাত' বলে 'দানশীলতা' বুঝিয়েছিলেন।

---

[১] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—২/২১২-২১৫

[২] ইবনু হাজার আসকালানী—আল-ইসাবাহ—৭/৬৭০

[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১৪২০, অধ্যায় : যাকাত; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৪৫২

আম্মাজান আয়েশা বলেন, '(কিন্তু এদিকে) নবী কারীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ নিজেদের হাত মাপামাপি করতেন, কার হাত বেশি লম্বা। আর যাইনাব নিজের হাতে কাজ করে করে দান-সাদাকাহ করতেন।' [১]

۞ উম্মুস সাহবাহ

তাঁর আসল নাম মুআযাহ বিনতু আবদিল্লাহ আল-আদাওইয়্যাহ। বিখ্যাত তাবিয়ী সিলাহ ইবনু আশইয়ামের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। ছিলেন আয়েশা ﷺ-এর সুযোগ্য ছাত্রী। প্রতিদিন সকালে তিনি বলতেন, 'আজকে আমি মারা যাব।' তারপর সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রোযা থাকতেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বলতেন, 'আজ রাতে আমি মারা যাব।' তারপর সকাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নামায পড়তেন।[২]

তিনি প্রায়শই একটা কথা বলতেন, 'ঘুমন্ত চোখের কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। অথচ সে অন্ধকার কবরে দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে থাকার কথা জানে।' (তবুও সে কীভাবে ঘুমায়?)'[৩]

শীতকালে তিনি পাতলা কাপড় পরতেন, যাতে শীতের কারণে ঘুম না আসে। এভাবে দীর্ঘরাত পর্যন্ত নামাযে কাটিয়ে দিতেন।[৪] তাঁর আমলের সামনে পুরুষরাও দুর্বল হয়ে যেত, কিন্তু নিজে ক্লান্তি বোধ করতেন না।[৫]

তাঁর স্বামী-সন্তান যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর এলাকার মহিলারা এল তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। তিনি বললেন, 'শুনুন, যদি অভ্যর্থনা জানাতে এসে থাকেন, তাহলে স্বাগতম। আর অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসে থাকলে ফিরে যেতে পারেন।' স্বামী শহীদ হওয়ার পর থেকে তিনি কখনও শয্যা গ্রহণ করেননি।[৬]

۞ এক রোমান নারীর ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনু হাসান বলেন, 'আমার একজন রোমীয় বংশভূত দাসী ছিল। তার প্রতি আমি খুব মুগ্ধ ছিলাম। প্রায়শই সে আমার সাথে ঘুমাত। একদিন

[১] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—২/২১৩
[২] ইমাম আহমাদ—কিতাবুয যুহদ—১১৫৬
[৩] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—৪/৫০৯
[৪] ইমাম আহমাদ—কিতাবুয যুহদ—১১৫৬
[৫] ইমাম শা'রানী—তাম্বীহুল মুগতারীন—১১৭
[৬] ইবনু সা'আদ—তবাকাতুল কুবরা—৭/১৩৭; আবু নুআইম—হিলয়াতুল আওলিয়া—২/২৩৯

মাঝরাতে আমি জাগ্রত হয়ে তাকে খুঁজে পেলাম না। তাই তাকে খুঁজতে বেরুলাম। গিয়ে দেখি সে সিজদায় পড়ে বলছে, "(হে আল্লাহ) আমার প্রতি আপনার ভালোবাসার খাতিরে আমার সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দিন।"

'আমি তাকে নেক আমলের উসীলা দেবার বৈধ পদ্ধতি শেখানোর উদ্দেশ্যে বললাম, "আমার প্রতি আপনার ভালোবাসার খাতিরে—এভাবে বলো না। বরং বলো, 'আপনার প্রতি আমার ভালোবাসার খাতিরে'।"

'সে বলল, "না মালিক, না। ওভাবে বলা যাবে না। আমার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা আছে বলেই তিনি আমাকে শিরকের পথ থেকে ইসলামের পথে এনেছেন। আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা আছে বলেই তিনি মাঝরাতে আমার চোখ থেকে ঘুম সরিয়ে নামাযে দাঁড় করিয়েছেন। অথচ তাঁর অনেক বান্দা এখন ঘুমাচ্ছে।"'[১]

হাবীবাহ আল-আদাওয়িয়্যাহ

আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ আল-মাক্কী বলেন, 'হাবীবাহ আল-আদাওয়িয়্যাহ ঘরের ছাদে গিয়ে এশার নামাযে দাঁড়াতেন। কাপড়-ওড়না গায়ের সাথে আঁটোসাঁটো করে বেঁধে নিতেন। তারপর বলতেন, "আল্লাহ, আকাশের তারাগুলো ডুবে গেছে। মানুষজনও ঘুমিয়ে গেছে। রাজা-বাদশাহরা বন্ধ করে দিয়েছে নিজ নিজ দরজা। প্রেমিকেরা নিজ নিজ প্রেমিকাকে নিয়ে নির্জনতা উপভোগ করছে। আর এই যে আমি, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।"

'তারপর তিনি নামায পড়তে থাকতেন। সকাল হলে বলতেন, "আমার প্রভু, রাত তো শেষ, দিন চলে এল। যদি আমি বুঝতে পারতাম, আমার রাতের ইবাদাত কবুল হলো কি না। কবুল হয়েছে জানতে পারলে আনন্দিত হতাম, আর কবুল হয়নি জানতে পারলে ইবাদাতে আরও শক্তি যোগাতাম। আপনার ইযযতের কসম!, এটাই আমার রীতি। আর আপনার রীতি হলো, আপনি আমাকে দূরে ঠেলে দেননি। আপনার সম্মানের শপথ! আমাকে আপনার দরজা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেও আমি সরব না। কারণ, আপনার দয়া ও মহানুভবতার

[১] ইবনুল জাওযী—সিফাতুস সফওয়া—৪/৪৬

ইয়াকীন ছাড়া আমার অন্তরে আছেটা কি!"'[১]

এক হাবশী মেয়ের ঘটনা

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, 'একদিন আমি বাজারে গেলাম। আমার সাথে আমার হাবশী দাসীটি ছিল। তাকে আমি বাজারের এক কোণায় রেখে আমার প্রয়োজনীয় কাজে বাজারের ভেতর গেলাম। যাওয়ার সময় তাকে বলে গেলাম, "খবরদার, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখান থেকে নড়বে না।"

'ফিরে এসে দেখি সে সেখানে নেই। তাকে না পেয়ে একাই বাড়ি ফিরলাম। আমি তার প্রতি অসম্ভব রেগে গিয়েছিলাম। আমার চেহারা দেখেই দাসীটি রাগের প্রতাপ টের পেয়েছিল। সে বলল, "মালিক! আমার ব্যাপারে হুটহাট সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনি আমাকে যে জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন সেখানে আমি কাউকে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন দেখতে পাইনি। তাই আমার আশঙ্কা হচ্ছিল সবাইকে নিয়ে এই মাটি ধ্বসে যাবে।"'আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার কথাগুলো শুনলাম। তারপর বললাম, "যাও, তুমি আজ থেকে আযাদ।" প্রত্যুত্তরে সে বলল, "আপনি কাজটা ঠিক করলেন না। আমি আপনার যত্নআত্তি করতাম, ফলে আমার দুটো সওয়াব হতো। আর এখন তার থেকে একটি কমে গেল।"'[২]

হাসান ইবনু সালিহ-এর দাসী

হাসান ইবনু সালিহ এবং তাঁর দাসী একসাথে (নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) রাত্রি জাগরণ করতেন। একদিন তিনি তাকে এক পরিবারের কাছে বিক্রি করে দিলেন। নতুন মালিকের ঘরে সে এশার নামায আদায়ের পর সকাল হওয়া অবধি অবিরাম নামায পড়ল। রাতের প্রতিটি ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার সময় দাসীটি পরিবারের লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলছিল, 'হে ঘরবাসী, তোমরা নামাযের জন্য উঠে যাও। হে ঘরবাসী, তোমরা নামাযে দাঁড়িয়ে যাও।'

তার ডাক শুনে পরিবারের লোকেরা বলেছিল, 'আমরা সকাল হওয়ার আগে উঠব না।' তারপর সেই দাসী হাসান ইবনু সালিহ রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে এসে অনুযোগ করে বলল, 'আপনি আমাকে এমন কিছু মানুষের কাছে বিক্রি

[১] আবু আবদির রহমান সুলামী (৪১২ হি.)—তাবাকাতুস সূফিয়াহ—৪১৪
[২] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন—১৫/২৭৭৬

করেছেন, যারা পুরো রাতটাই ঘুমিয়ে কাটায়। আর আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তাদের ঘুম দেখে আমিও না অলস হয়ে যাই।'

এই রকম নামাযী নারীর যথাযথ হক আদায় করার জন্য শেষমেশ হাসান ইবনু সালিহ রাহিমাহুল্লাহ তাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনলেন।[১]

আগেকার নেককার নারীদের বিদ্যা-বুদ্ধির কিছু নমুনা

আগের যুগের পুণ্যবতী নারীরা দ্বীন শেখার প্রতি সীমাহীন আগ্রহী ছিলেন। যেন নিজেরা শিখে জীবন পরিচালনা করতে পারেন। অন্য বোনকেও দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারেন।

নবী কারীম ﷺ-এর নারী-সাহাবীদের ইলম অর্জনের আগ্রহের কথা আমরা কমবেশি শুনেছি। তাঁরা নবীজির কাছে আবেদন করেছিলেন, যেন তিনি নারীদেরকে নিয়ে একটি আলাদা মজলিস করেন।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একবার জনৈকা নারী নবীজির কাছে নিবেদন করলেন, "আল্লাহর রাসূল, পুরুষরা সবাই আপনার হাদীসগুলো শিখে নিচ্ছেন। তাহলে আপনি আমাদের জন্য একটি দিন ঠিক করুন। আমরা সেদিন আপনার কাছে আসব। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা শিখিয়েছেন, আপনি আমাদেরকে সেদিন তা শিখাবেন।"' নবীজি ﷺ তাঁকে বললেন, "তাহলে তোমরা অমুক দিন অমুক জায়গায় একত্রিত হবে।" কথামতো তাঁরা সবাই নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত জায়গায় একত্রিত হলেন। নবী কারীম ﷺ তাঁদের কাছে গিয়ে আল্লাহ তাআলার শেখানো ইলম থেকে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন।'[২]

এসব নারীগণ কেনই-বা ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হবেন না? কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতটিতেই তো রয়েছে—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ۝

'পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন

[১] ইবনুল জাওযী—সিফাতুস সফওয়া—৩/১৯৫
[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১০২; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ২৬৩৪

> মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।'[১]

এই আয়াতগুলোই তো ইলম শেখা ও চর্চার মর্যাদা ঘোষণা করছে। যে-কেউ এই আয়াত পাঠ করবে, তার শিরায় বইতে থাকবে ইলমের প্রতি ভালোবাসা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

> '(হে নবী) আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা উভয়ই কি সমান?'[২]

উম্মুল মুমিনীনদেরকে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ

> 'আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ করবে।'[৩]

নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

> 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয।'[৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

> 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই

[১] সূরা আলাক, আয়াত-ক্রম : ১-৫
[২] সূরা যুমার, আয়াত-ক্রম : ৯
[৩] সূরা আহযাব, আয়াত-ক্রম : ৩৩, ৩৪
[৪] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ২২৪, অধ্যায় : ভূমিকা। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে সনদ হাসান।

> আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।'[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তাদেরকে শিষ্টাচার শেখাও, ইলম অর্জন করাও।'[২] ইমাম হাকিম এবং ইবনুল মুনজির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা নিজেরা কল্যাণকর বিষয়াদি শেখো এবং পরিবার-পরিজনকেও শেখাও। পাশাপাশি তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।'[৩]

এর আলোকেই ইমাম ইবনু হাযাম বলেন, 'নারীদেরকেও পুরুষদের মতো দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো অত্যাবশ্যক। পুরুষদের মতো তাদেরকেও পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহারের মধ্যে হালাল-হারামের জ্ঞান এবং নামায, রোযা ও পাক-পবিত্র থাকার সকল বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত করানো অবশ্য-কর্তব্য। এ-ব্যাপারে নারী-পুরুষ কোনো ভেদাভেদ থাকবে না।

'তারা মৌখিক, শারীরিক—সব ধরনের (দ্বীনী বিষয় সম্পর্কে) বিদ্যার্জন করবে। হয় নিজে নিজে শিখবে, নতুবা যে তাদেরকে শেখাবে তার সাথে বৈধভাবে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে শিখে নেবে। আর মুসলিম শাসকের দায়িত্ব হলো নারীদের শেখানোর ব্যাপারে লোকদের থেকে কৈফিয়ত নেওয়া।'[৪]

আল্লামা বালাজুরী রচিত ফুতুহুল বুলদান-এ আছে, আম্মাজান হাফসা বিনতু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জাহেলী যুগে 'আশ-শিফাউল আদাওইয়্যাহ'[৫] নামের এক নারী-লিপিকারের কাছে লেখা শিখতেন। নবী কারীম ﷺ-এর সঙ্গে সংসার শুরু হবার পর নবীজি তাঁকে আরও সুন্দর ও সর্বোত্তম হস্তলিপি শেখানোর জন্য আশ-শিফা লিপিকারকে নিযুক্ত করেন।[৬]

আম্মাজান আয়েশা ؓ বলেন, 'আনসারী নারীরা কত ভালো! দ্বীনী ইলম শেখার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।'[৭]

---

[১] সূরা তাহরীম, আয়াত-ক্রম : ৬

[২] তাফসীরুত তাবারী—২৩/১০৩। সনদ দুর্বল, অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

[৩] মুসতাদরাকু হাকিম—২/৫৩৫ [৩৮২৬]। সনদ সহীহ।

[৪] ইমাম ইবনু হাযাম—আল-আহকাম—১/৪১৩

[৫] তাঁর আসল নাম শিফা বিনতু আবদিল্লাহ আল-আদাওইয়্যাহ। -ইবনু হাজার আসকালানী—আল-ইসাবাহ— ৭/৭২৭, ৭২৮

[৬] ফুতূহুল বুলদান—১/৪৫৪

[৭] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ৩৩২, অধ্যায় : হায়েয

এই যে আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, নবী কারীম ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী, ছিলেন ফকীহা, আল্লাহওয়ালী এবং সাত আকাশের উপর (সবার কাছে) তিনি পূতপবিত্র। নবীজির ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ঊনিশও পার হয়নি।

তবুও পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর এককভাবে বর্ণনাকৃত হাদীস জালের মতো বিস্তীর্ণ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর মতো এত অধিক-সংখ্যক হাদীস উম্মতের কাছে বর্ণনা করেছেন—এমন সাহাবী আর কেউ নেই। বরং তিনি আবু হুরায়রার চেয়েও প্রাজ্ঞ ও বেশি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।

ইমাম যুহরী বলেন, 'যদি আয়েশা ﷺ-এর জ্ঞান গোটা নারীকুলের সবার জ্ঞানের সাথে মেলানো হয়, তাহলে তাঁর জ্ঞানই সর্বসেরা হবে।'[১]

আতা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আয়েশা ﷺ একজন ফকীহা এবং সর্বোত্তম সিদ্ধান্তদাতা ছিলেন।'[২]

উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, 'ফিকাহশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা এবং আরবী কাব্যগীতি সম্পর্কে আয়েশা ﷺ-এর চেয়ে প্রাজ্ঞ আমি অন্য কাউকে দেখিনি।'[৩]

আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী কারীম ﷺ-এর সাহাবীদের কাছে কখনো কোনো হাদীস যদি অস্পষ্ট মনে হতো, তাহলে তাঁরা আয়েশা ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে সঠিক সমাধান পেয়ে যেতেন।'[৪]

ইমাম মাসরুক বলেন, 'নবীজি ﷺ-এর বড় বড় সাহাবীকে আমি দেখেছি, তাঁরা আয়েশা ﷺ থেকে 'ফারায়িয' (উত্তরাধিকার বণ্টন) সংক্রান্ত বিষয় জেনে নিতেন।'[৫]

ইমাম মাসরুককে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আয়েশা ﷺ কি 'ফারায়িয' সংক্রান্ত বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন?' প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ,

---

[১] যাহাবী—সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—২/১৮৫

[২] মুসতাদরাকু হাকিম—৪/১৫ [৬৭৪৮]

[৩] ইবনু সাআদ, তাবাকাতুল কুবরা—৭/৩৯,৫৬

[৪] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ৩৮৮৩, অধ্যায় : সাহাবীগণের মর্যাদা। সনদ সহীহ।

[৫] মুসতাদরাকু হাকিম—৪/১২ [৬৭৩৬]

আমি রাসূল ﷺ-এর বড় বড় বুযুর্গ সাহাবীকে দেখেছি, তাঁরা 'ফারায়িয' সংক্রান্ত বিষয়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নিতেন।'[১]

হাফিয আবু হাফস উমর ইবনু আবদিল মাজীদ তাঁর রচিত ইজাহু মা লা ইয়াসাউল মুহাদ্দিসু জাহলাহু গ্রন্থে বলেছেন, 'সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আহকাম (বিধিবিধান) সংক্রান্ত এক হাজার ২০০টি হাদীস রয়েছে। এই দুটো কিতাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুইশ আশিরও ঊর্ধ্বে। সেগুলোর মধ্যে খুব কমই আহকাম (বিধিবিধান) বিষয়ের বাইরে।'

হাকিম আবু আবদিল্লাহ বলেন, 'শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ (বিষয়াদি) আয়েশা ﷺ থেকেই পাওয়া গেছে।'[২]

তিনি ছিলেন মুজতাহিদা (কুরআন-হাদীস থেকে শরীয়তের বিষয়াদি উদ্ঘাটনকারী) নারী। আল্লাহর কিতাবের সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে তাঁর ছিল কার্যকর অন্তর্দৃষ্টি। খুব ভালো কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। সাহাবায়ে কেরামের সকলের মাঝে এসব গুণাবলি একসাথে পাওয়া যেত না। বিশেষ কয়েকজন সাহাবী ছিলেন, যাঁদের মাঝে এসকল গুণাবলির সবকটির অপূর্ব সমন্বয় ছিল। আম্মাজান ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম একজন।

নবী কারীম ﷺ-এর সাহাবীদের মতামতের ওপর তাঁর অনেক মন্তব্য ও সংশোধনী ছিল। তাঁরা যখন এ ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে পারতেন, তখন তাঁরা আম্মাজানের মতটাই মেনে নিতেন।[৩]

নারীরা তাঁর বাড়ি আসতেন দ্বীন শিখতে। সেই মাখযুমী গোত্রের নারী, যাঁর হাত কেটে দেওয়া হয়েছিল, তিনি আম্মাজান থেকে হাদীস থেকে বর্ণনা করতেন। 'হাত কাটার পর থেকে তিনি ইলম অর্জনের জন্য আয়েশা ﷺ-এর বাড়ি আসতেন।'[৪]

যুগ পরম্পরায় এমন অনেক মহিয়সী নারীকে পাওয়া যায়, যাঁরা ফরযে আইন

---

[১] ইবনুল কায়্যিম—আলামুল মুকিঈন—২/৩০

[২] ইমাম যারকাশী—আল-ইজাবাহ—১/৩৯

[৩] বিস্তারিত দেখুন—আবু আহমাদ তাবারী—আস-সামতুস সামীন—৩৩-৯৪

[৪] তাঁর নাম ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ (আবুল আসাদ) আল-মাখযুমী। তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী হাত কাটার পর যখন তাঁর তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়, এরপর থেকে তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনে নবীজির বাড়িতে আসতেন। - বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৪৩০৪, অধ্যায় : মাগাযী

(আবশ্যকীয়) পরিমাণ বিদ্যার্জন থেকে এগিয়ে ফরযে কিফায়া (অতিরিক্ত) পরিমাণ বিদ্যার্জনের প্রতিও ঝুঁকেছিলেন। তাঁদের মাঝে ছিলেন অনেক বড় বড় হাদীস বিশারদ। এমনকি তাঁদের থেকে হাদীসের ইজাযত পাবার জন্য পুরুষ মুহাদ্দিসদেরও ভিড় লেগে থাকত।

৮ খণ্ডের আত-তবাকাতুল কাবীর কিতাবের লেখক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাদ তাঁর কিতাবের একটি খণ্ড শুধু নারী হাদীস বিশারদদের বর্ণনা নিয়ে সাজিয়েছেন। সেখানে তিনি সাতশোর অধিক নারী মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা রাসূল ﷺ থেকে বা তাঁর সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম উম্মাহর ইলমী কাননের মান্যবর ইমামগণ।

ফাকীহা, যাহিদাহ উম্মুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'সবকিছুতেই আমার ইবাদাত-বন্দেগী খোঁজার একটা ঝোঁক থাকে। তবে আমি উলামায়ে কেরামের মজলিস এবং তাঁদের পরস্পরের আলোচনা-পর্যালোচনার চেয়ে আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তিদায়ক অন্য কিছু পাইনি।' [১]

ইসলামের স্বর্ণযুগের সকল গুরুত্বপূর্ণ আলিমই নিজ নিজ যুগের আলিমা, হাফিযা, মুহাদ্দিসা ও মুজতাহিদাদের কাছ থেকে শরয়ী বিধিবিধান অক্ষুণ্ণ রেখে ইলম হাসিল করেছেন এবং তা বর্ণনাও করেছেন। একমাত্র ইমাম যাহাবীর ব্যাপারে শোনা যায় যে, তিনি নারী বর্ণনাকারীদের এড়িয়ে চলতেন। তবে তিনিও তাঁর বিখ্যাত রিজালগ্রন্থ (বর্ণনাকারী-সম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ) মীযানুল ই'তিদাল-এ নারী-বর্ণনাকারীদের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। শুধু বৃত্তান্ত তুলে ধরেই ক্ষান্ত হননি, নারী-মুহাদ্দিসাগণ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বলেন, **'আমার জানামতে এমন কোনো নারী-মুহাদ্দিসা নেই, যাঁকে হাদীসশাস্ত্রের নীতিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগে পরিত্যাগ করা হয়েছে।'** [২]

হাফিয ইবনু আসাকিরের (মৃত্যু : ৫৭১ হিজরী) কথাই ধরুন। তিনি ছিলেন হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য এবং সদা সত্যভাষী ব্যক্তি। তাঁর শাইখ ও উস্তাদদের মধ্যে ৮০ জনেরও অধিক ছিলেন নারী। ইতিহাসে কোনো জাতি কি কখনো শুনেছে যে—একজন জ্ঞানী ৮০ জনেরও অধিক

[১] ইবনুল আসাকির—তারীখু মাদীনাতি দিমাশক—৭০/১৫৬; ইমাম আহমাদ—কিতাবুয যুহদ—৯২১
[২] মীযানুল ই'তিদাল—৪/৬০৪

নারীর কাছে একটিমাত্র বিষয়ে বিদ্যার্জন করেছেন? তাহলে যাঁদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে পারেননি, বা যাঁদের থেকে তিনি কিছু শিখতে পারেননি, তাঁদের সংখ্যা কত? ইবনু আসাকির এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানাও অতিক্রম করেননি। মিশর ভূখণ্ডে তাঁর পদচারণ হয়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে, এমনকি আন্দালুসেও তিনি যাননি। এসব এলাকার জ্ঞানী-গুণী আলিমাদের কাছে তাঁর তো যাওয়াই হয়নি, এই ৮০ জনের সবাই তাঁর নিজ এলাকার।

মুসলিম আলেমাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইমাম শাফিয়ী, ইমাম বুখারী, ইবনু খাল্লিকান ইবনু হিব্বান প্রমুখের মতো বড় বড় ব্যক্তিদের উসতাযাহ এবং মুরব্বী।[১]

'আমার কাছে বসুন। আমি আপনাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের জ্ঞান শিখিয়ে দিই'

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ'র মেয়ে। বাবারই এক ছাত্রের সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। সকালবেলা স্বামী চাদর হাতে ঘর থেকে বেরুনোর সময় স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?' স্বামী বললেন, 'সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের (শ্বশুরের) মজলিসে যাচ্ছি। তুমিও কি যাবে?' নববধূ স্বামীকে বললেন, 'আপনি আমার কাছে বসুন। আমি আপনাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের জ্ঞান শিখিয়ে দিচ্ছি।'[২]

এভাবেই বাবারা নিজের মেয়েদের উস্তাযাহ বানিয়ে দিতেন।

ইমাম মালিকের মেয়ে

ছাত্ররা ইমাম মালিক ﷺ-কে 'মুয়াত্তা' কিতাবটি পড়ে শোনাতেন। পড়ার সময় যদি কোনো এক শব্দের মধ্যে কারো কোনো ভুলচুক হতো বা কম-বেশি হয়ে যেত, তাঁর মেয়ে দরজায় আঘাত করতেন। তখন বাবা (ইমাম মালিক) ছাত্রটিকে বলতেন, 'আবার পড়ো। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।' ছাত্র পুনরায় পড়তেন।

[১] আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান—তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম—১/২৭৯
[২] ইবনুল হাজ্জ—আল-মাদখাল—১/২১৫

এবং ভুল শনাক্ত হতো।[১] মানে মেয়ে পূর্বেই মুখস্থ করে রেখেছেন বাবার হাদীস ও ফিকহের কিতাব!

ইমাম মালিকের দাসী

আসহাব ﵀ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মদীনাবাসীদের মধ্যে নামায-কালামে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দাসীদের কাছ থেকে রুটির বিনিময়ে সবজি ক্রয় করতেন। তারা রুটি না নিয়ে বাকিতে সবজি বিক্রি করত না। একবার তিনি জনৈকা দাসীকে বললেন, 'সন্ধ্যায় যখন আমাদের রুটি চলে আসবে তখন তুমি আবার এসো, আমরা তোমাকে রুটি দিয়ে মূল্য পরিশোধ করে দেব। এখন বাকিতে সবজি দিয়ে চলে যাও।'দাসী বলল, 'এটা ঠিক হবে না।' তিনি বললেন, 'কেন ঠিক হবে না?' সে বলল, 'কারণ এখানে খাবারের বিনিময়ে খাবারের বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু সামনাসামনি হচ্ছে না।'

দাসীর প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাব শুনে অন্যদের কাছে তিনি এর পরিচয় জানতে চাইলেন। বলা হলো, 'সে হচ্ছে ইমাম মালিক ইবনু আনাসের দাসী।'[২]

দাসীরই ফিকহের ইলম কত বিস্তৃত, চিন্তা করুন পাঠক!

আলাউদ্দীন সমরকন্দী'র মেয়ে

তুহফাতুল ফুকাহা কিতাবের লেখক আল্লামা আলাউদ্দীন সমরকন্দীর মেয়ে ছিলেন আলিমা ফকীহা ফাতিমা। তিনি তাঁর বাবার কিতাব তুহফাতুল ফুকাহা মুখস্থ করতেন। রোমের অনেক রাজা-বাদশাহ্ পর্যন্ত সেই কিতাব থেকে আইন শিখতেন। তারপর 'মালিকুল উলামা' (আলিমদের সম্রাট) উপাধিপ্রাপ্ত আবু বকর আল-কাসানী যখন তুহফা কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাদায়েউস সানাঈ রচনা করে সেটি ফাতিমার বাবা তাঁর শাইখ আলাউদ্দীন সমরকন্দী'র কাছে পেশ করলেন, তখন তিনি অনেক খুশি হয়েছিলেন। খুশি হয়ে সেই কিতাবটিকে দেনমোহর ধরে তিনি আল-কাসানীর কাছে মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

ফাতিমা তাঁর বাবা আলাউদ্দীন সমরকন্দী রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে ফিকাহ শিখতেন এবং তুহফা কিতাব মুখস্থ করতেন। স্বামী কোনো ভুল করে ফেললে তাঁকে সঠিক

[১] ইবনুল হাজ্জ—আল-মাদখাল—১/২১৫
[২] ইবনুল হাজ্জ—আল-মাদখাল—১/২১৫

বিষয়টি বাতলে দিতেন। ফাতিমার কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে ফতোয়ার নিচে তাঁর এবং তাঁর বাবার দস্তখত থাকত। বাদায়েউস সানাঈ কিতাবের লেখকের সাথে বিয়ে হওয়ার পর ফতোয়ার নিচে তাঁর, তাঁর বাবার এবং তাঁর স্বামীর দস্তখত থাকত।[১]

۞ হাফিয আল-হাইসামী'র স্ত্রী

হাফিয আল-হাইসামীর স্ত্রী ছিলেন তাঁর শাইখ হাফিয আল-ইরাকী'র মেয়ে। তিনি হাদীসের কিতাব পর্যালোচনার ক্ষেত্রে স্বামীকে সহযোগিতা করতেন।[২]

۞ সালাহউদ্দীন আইয়ুবী'র বোন

শাইখ আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম বলেন, 'আমি ইহসা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলাম। তখন আমি স্বয়ং আলে মুবারকের (মুবারকের পরিবারের) কাছে সুনানু আবি দাউদের একটি কপি দেখতে পেলাম। তাতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবী'র বোনের লেখা টীকা যুক্ত ছিল।'[৩]

বলা ভালো, ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাও ফাতিমা বিনতু জাওহারের ছাত্র ছিলেন।[৪]

যাঁদের পবিত্র স্মৃতি আমরা এতক্ষণ রোমন্থন করলাম, নারী যদি হয় এঁদের মতো, তাহলে সে নারী পুরুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে। শামস (সূর্য) স্ত্রীলিঙ্গ বাচক হলেও এতে কোনো দোষ নেই। হিলাল (চাঁদ) পুংলিঙ্গ বাচক হলেও এতে গর্বের কিছু নেই।

ধৈর্যধারণ ও জিহাদের ময়দানে পূর্ববর্তী নারীদের অবদান

পাঠক, আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-বন্দেগী, ইলমের পিপাসা এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ববর্তী পুণ্যবতী নারীদের স্পৃহার কথা হয়তো আপনি জানেন। তাঁদের এই স্পৃহা আল্লাহর পথে নিজের জীবন, প্রিয়জনের

[১] মিন আ'লাকিল উলামা—১২৫

[২] আবদুল্লাহ ইবনু সিদ্দীক—তানামুল নিয়াহ—৩৯

[৩] মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকীতি—আযওয়াউল বায়ান ফী ঈযাহিল কুরআনি বিল কুরআন—৯/২২; সূরা আলাক, আয়াত-ক্রম : ১-এর ব্যাখ্যায়।

[৪] জামাল ইবনু মুহাম্মাদ আস-সায়্যিদ, ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (জীবনীগ্রন্থ)—১/১৭১

জীবন উৎসর্গ করা পর্যন্তও গড়াত। এটা হতো হয় মুশরিকদের অত্যাচারে ধৈর্য ধরার মাধ্যমে, অথবা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজের জীবন উৎসর্গ করার মাধ্যমে।

۞ সুমাইয়া ﷺ

কেবল এতটুকু থেকেই তাঁদের অদম্য স্পৃহার পরিচয় মেলে যে, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন একজন নারী। আম্মার ইবনু ইয়াসিরের মা সুমাইয়া ﷺ।

ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনু সাআদ বর্ণনা করেন, 'ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ নারী ছিলেন আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মা সুমাইয়া। তিনি ছিলেন বয়স্ক দুর্বল বৃদ্ধা। বদর-যুদ্ধে আবু জাহাল মারা যাওয়ার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, "আল্লাহ তোমার মায়ের খুনিকে হত্যা করেছেন।"আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মা সুমাইয়া বিনতু খুব্বাত রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন ইসলামগ্রহণকারীদের মধ্যে সপ্তম নারী। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের সময় যখন কাঠফাটা রোদের উত্তাপে মাটি উত্তপ্ত হতো, তখন বনু মাখযুম গোত্রের লোকেরা তাঁকে, তাঁর ছেলে ও স্বামীসহ মরুভূমিতে নিয়ে আসত। তাঁদেরকে লোহার বর্ম পরিধান করাত। তারপর এর উপর উত্তপ্ত বালু ঢেলে দিতো। কখনো তাদেরকে পাথর দ্বারা আঘাত করত।

মক্কার উত্তপ্ত ফাঁকা মাঠে তাঁদেরকে এমন নির্মম নির্যাতনের সময় একদিন নবী কারীম ﷺ আম্মার ও আম্মারের বাবা-মায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'হে ইয়াসিরের পরিবার, ধৈর্য ধরো। তোমাদের আবাসস্থল হচ্ছে জান্নাত।'[১]

অগত্যা বাপ-বেটা উভয়ে মুখে কুফরি কথা প্রকাশ করে এই তিক্ত নির্যাতন থেকে রেহাই পেলেন। কিন্তু তাঁদের অন্তর ছিল ঈমানে ভরপুর। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে তাঁদের উপমা দিয়ে বলেছেন—

---

[১] ইবনু হাজার আসকালানী—আল-ইসাবাহ-৭/৭১৩; আলবানী 'তাখরিজু ফিকহিস সীরাহ' কিতাবের ১০৩ নম্বর পৃষ্ঠায় এটাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

> *'তবে হ্যাঁ, যাকে (কুফরি কথা বলতে) বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে (তার কথা ভিন্ন)।'*[১]

কিন্তু মা? তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। নির্যাতন সহ্য করলেন। জালিমদের কাঙ্ক্ষিত বাসনা—ঈমান আনার পর আবার কুফরিতে ফিরে যাবেন, তিনি তাদের এ আশা পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে জালিমরা তাঁর জীবনটাই নিয়ে নিল। ভয়ঙ্করভাবে তাঁর রক্তপাত ঘটাল। পাপিষ্ঠ আবু জাহাল ইবনু হিশাম তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শা বিদ্ধ করল। তিনি শহীদ হলেন, ইসলামের প্রথম শহীদ।[২]

যিন্নিরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা

তাঁর মতো আরও অনেক নারী সাহাবী ছিলেন। কাফিররা তাঁদের কাউকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিত, কাউকে দগ্ধ করার জন্য উত্তপ্ত লোহার ব্যবস্থা করত, ছোট ছোট বাচ্চাকে দিয়ে চোখে খোঁচা দেয়াত অনেকের, এতে তাঁদের দৃষ্টিশক্তিই নষ্ট হয়ে যেত।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র দাসী যিন্নিরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে এভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। (ইসলামগ্রহণের আগে) উমর নিজে এবং কুরাইশদের কিছু লোক যিন্নিরাহকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। এভাবে নির্যাতনের পর যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল, তখন মুশরিকরা বলেছিল, '(আমাদের দেবী) লাত ও উযযা তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।'

তিনি প্রত্যুত্তরে তাদেরকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, তা কক্ষণো নয়। যারা লাত এবং উযযার উপাসনা করে, তাদের সম্পর্কে এই মূর্তিদ্বয় কিছুই জানে না। আমার চক্ষু নষ্ট হওয়ার ফায়সালা আসমান থেকে হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম।' বর্ণিত আছে, এ দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিল। এটা দেখে কুরাইশরা বলেছিল, 'এটা নির্ঘাত মুহাম্মাদের জাদু।' তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ক্রয় করে আযাদ

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত-ক্রম : ১০৬

[২] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ—৩৫৭৭০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৩/৫৯। সনদ মুরসাল। বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।

করে দিয়েছিলেন।[১]

উম্মু শারীক ﵂

তাঁদের কাউকে মুশরিকরা সীমাতিরিক্ত মধু পান করাত। হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে উত্তপ্ত বালুর মাঝে ফেলে রাখত। প্রচণ্ড খরতাপে শরীরের গোশত গলে গলে পড়ত। এমনকি হাড্ডি পর্যন্ত বেরিয়ে আসত। অবশেষে তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি মারা যেতেন। এমন নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন উম্মু শারীক আযিয়্যাহ বিনতু জাবির ইবনি হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহা।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মক্কা থাকতেই উম্মু শারীকের মনে ইসলামপ্রীতি বদ্ধমূল হয়ে ছিল। তিনি একসময় ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর গোপনে গোপনে কুরাইশ নারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। একদিন মক্কাবাসীর সামনে তাঁর কর্মতৎপরতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তারা তাঁকে আটকিয়ে বলে দেয়, "যদি তোমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর প্রভাব না থাকত, তাহলে তোমার সাথে যা আচরণ করার দরকার আমরা করতাম। কিন্তু আমরা (নিজেরা কিছু না করে) তোমাকে তাদের কাছে অর্পণ করলাম।"'

উম্মু শারীক বলেন, 'তারা (আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা) আমাকে এমন উটের পিঠে আরোহণ করাল আমার নিচে পা রাখার মতো কোনো জায়গা সেখানে ছিল না। এবং (ধরার মতোও) অন্য কিছুই সেখানে ছিল না। তারা আমাকে তিনদিন পানাহার ছাড়া উপোস রাখল। তারা যখনই কোনো জায়গায় যাত্রাবিরতি করত, আমাকে সূর্যের খরতাপে দাঁড় করিয়ে নিজেরা ছায়ায় বিশ্রাম নিত। পুনরায় রওনা হওয়া পর্যন্ত তারা আমাকে কিছু খেতে দিত না।

'দিনগুলো এভাবেই কাটছিল। হঠাৎ একদিন (রাতে) আমি ঠান্ডা একটা জিনিসের স্পর্শ অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পর আবার এমন হলো। আমি হাত বাড়ালাম। সেটি ছিল একটি পানির বালতি। আমি সেখান থেকে সামান্য পানি পান করলাম। তারপর সেটি আমার হাত থেকে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার সেটি ফিরে এল। আমি হাত বাড়িয়ে সামান্য পরিমাণ পান করে নিলাম। তারপর

[১] সীরাতু ইবনি হিশাম—১/১২৬

আবার সেটি আমার হাত থেকে ফসকে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার এল। এভাবে কয়েকবার চলার পর আমি তৃপ্ত হয়ে যাই।

'পরে বালতির সবটুকু পানি আমার গায়ে এবং কাপড়ে ঢেলে দেওয়া হয়। সকালে সবাই জাগ্রত হয়ে পানির আর্দ্রতা দেখতে পায়। এবং তাদের কাছে আমাকে বেশ সতেজ-চাঙ্গা মনে হয়। তখন তারা আমাকে বলে, "তুমি তোমার বাঁধন খুলে আমাদের পানির পাত্র থেকে পানি পান করেছ?" আমি বললাম, "না, আল্লাহর কসম! আমি এ-কাজ করিনি। যা ঘটার তাই ঘটেছিল (যা ঘটেছিল আমি সবকিছু বলে দিলাম)।" তারা বলল, "যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমার ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকে উত্তম।"'তারপর তারা তাদের পানির পাত্রগুলো দেখল। সেগুলো আগের মতোই ঠিকঠাক আছে। পরে তারা তৎক্ষণাৎ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।'[১]

۞ আরেকজন দাসী

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনু মুআম্মালের একজন মুসলিম দাসীকে নির্যাতনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে যখন-তখন মারতেন। ক্লান্ত হয়ে গেলে দাসীকে বলতেন, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ক্লান্ত হওয়ার কারণে ছেড়ে দিলাম।' তখন দাসী তাঁকে বলত, 'আল্লাহ তাআলাও আপনার সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন।'[২]

۞ সাফিয়্যাহ বিনতু আবদিল মুত্তালিব, প্রিয় ভাইয়ের নির্মম শাহাদাতে তাঁর ধৈর্য

পাঠক, সাফিয়্যাহ বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা'র বীরত্বের কথা আমরা শুরুতেই শুনেছি। তাঁর কোলে তাঁর ছেলে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রেখেই স্বামী ইন্তেকাল করেছিলেন। নবীজির ফুপুদের মধ্যে তিনিই ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে জানা যায়। জীবনের ৬০টি বসন্ত পার হয়ে যাওয়ার পর হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। উহুদের ময়দানে তাঁর ভাতিজা

---

[১] আবু নুআইম—হিলয়াতুল আওলিয়া—২/৬৬; ইবনু সাআদ—তাবাকাতুল কুবরা—৮/১১০-১১১, ইবনু হাজার আসকালানী—আল-ইসাবাহ—৮/২৪৮

[২] ইবনু সাআদ—তাবাকাতুল কুবরা—২/১৮৭

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছেলে যুবাইর এবং ভাই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

উহুদ-যুদ্ধে যখন মুসলমানরা চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন এই নারী আহত সিংহীর মতো গর্জে ওঠেন। পশ্চাদপসরণকারী একজনের কাছ থেকে বল্লম ছিনিয়ে নেন। কাতার ভেঙে সামনে আসতে থাকেন। এবং সিংহীর হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক। তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেখে পিছু হটে যাচ্ছ।'

নবী কারীম ﷺ তখন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। মুশরিকরা তাঁর ভাই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ফেলেছে (দেখলে সহ্য করতে পারবেন না)।' যুবাইর তাঁর মা সাফিয়্যাকে ডেকে বললেন, 'মা, এদিকে আসুন। মা, এদিকে আসুন।' তিনি বললেন, 'আমার কাছ থেকে সরে যাও। তোমার কোনো মা নেই। তুমি নবীজিকে রেখে পেছনে সরে যাচ্ছ?' ছেলে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন।' তিনি বললেন, 'সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। সবাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের সামনে থেমে যায় (আমিও থেমে গেলাম)।' তিনি আরও বললেন, 'আমি শুনতে পেয়েছি আমার ভাইয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। এটা হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ তাআলার রাস্তায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।'

ফুপু নিজেকে সামলে নিয়েছেন বুঝতে পেরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাহ ﵂-এর ছেলে যুবাইরকে বললেন, 'তাঁকে যেতে দাও।' যখন যুদ্ধের ভয়াবহতা কমে এল, সাফিয়্যাহ ﵂ ভাই হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র পাশে গিয়ে মহান ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়ানোর মতো (সম্মান প্রদর্শন) করে দাঁড়ালেন। সায়্যিদুনা হামযা'র পেট ফেড়ে ফেলা হয়েছিল। ভেতর থেকে কলিজা বের করা হয়েছিল। নাক কেটে দেওয়া হয়েছিল। উভয় কান কেটে দেওয়া হয়েছিল। চেহারাকেও বিকৃত করে ফেলা হয়েছিল।

সাফিয়্যাহ ভাইয়ের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এবং প্রশান্ত চিত্তে বললেন, 'নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়েছে। আর আমি আল্লাহ তাআলার

সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট আছি।' তাঁর দুচোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। আর তাঁর অন্তরে দাউদাউ করে জ্বলছিল ব্যথার আগুন। 'চোখ দিয়ে যে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তা চোখের পানি নয়, তা যেন অন্তরের পানি ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে।' তিনি বলছিলেন, 'আমি ধৈর্য ধরব... আল্লাহ তাআলা চাইলে এর উত্তম বিনিময় আমি পাব... আমি ধৈর্য ধরব... আল্লাহ তাআলা চাইলে এর উত্তম বিনিময় আমি পাব...'

এই ছিল সাফিয়্যা ﵂-এর অন্তরের জোর।

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি ছিলেন মুসলিম মায়েদের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি একাই ছেলেকে প্রতিপালন করেছেন, ভাইয়ের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম নারী, যিনি একজন মুশরিককে হত্যা করেছেন। এই মুসলিম জাতির মাঝে তাঁর মতো আরও অনেক নারীরই জন্ম হয়েছে, এমন না, বরং তাঁর মতো অনেক পুরুষেরও জন্ম হয়েছে। আজ উম্মাহর পুরুষগুলো সাফিয়্যা'র মতো যদি হতো, বদলে যেত পৃথিবীর চেহারা।[১]

۞ আসমা বিনতু আবি বকর, ছেলের শাহাদাতে তাঁর ধৈর্য–

পাঠক, এখন শুনুন যাতুন নিতাক্বাইন (দুই ফিতাওয়ালী) আসমা বিনতু আবি বকর ﵂-এর কথা। তিনি একটি কাজের কারণে এমন সৌভাগ্যবতী হয়েছেন যে, তাঁর পূর্বাপর আর কোনো নারী এমন সৌভাগ্য পাননি। আর তা হলো হিজরত করার পথে গুহায় পিতা ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য রসদ সরবরাহ করা।

তিনি তখন ৯৭ বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় খিলাফতের ঘোষণা দিয়েছেন। সিরিয়ার খিলাফতের অধীনে হাজ্জাজ এসেছে মক্কা আক্রমণ করতে। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে, তাঁর দুই পুত্রও গিয়ে যোগ দিয়েছে শত্রুপক্ষে। শেষবারের মতো গেলেন মা আসমা বিনতু আবি বকরের কাছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করণীয়? আত্মসমর্পণ করে সিরিয়ার খিলাফতে বাইআত

---

[১] আলী আল-কারনী—হ্য-কাযা আল্লামাতনিল হায়াত—৮৯-৯১

দেবেন, নাকি সত্যের জন্য জীবন দেবেন?

আসমা ﵂ বললেন, 'তুমি নিজেই নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানো। তুমি যদি মনে করো সঠিক পথে আছ এবং লোকজনকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছ, তাহলে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা পর্যন্ত তুমি অটল থাকো। আর যদি দুনিয়ার ক্ষমতার প্রতি তোমার কোনো মোহ থাকে, তাহলে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ নেই। তুমি নিজেও ধ্বংস হবে এবং তোমার সঙ্গীদেরকেও ধ্বংস করবে।'

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর বললেন, 'আম্মা, দুনিয়ার কোনো মোহ আমার নেই। কারো প্রতি কখনো অত্যাচার আমি করিনি। কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমার অন্তরের কথা এবং আমার নিয়ত আল্লাহ তাআলাই জানেন।'

মা বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ তাআলার কাছে আমি আশাবাদী, যদি তুমি তাঁর কাছে আমার আগেই চলে যাও তাহলে তোমার ব্যাপারে আমার শোক কল্যাণকর হবে।'

মা-ছেলে দুজনই সেরে নিলেন বিদায়ী মুলাকাত। মা বললেন, 'বেটা, কাছে এসো। আমি তোমার শরীরের ঘ্রাণ নেব। তোমাকে শেষবারের মতো একটু বুকে জড়াব।'

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর তাঁর সামনে ঝুঁকে গেলেন। তাঁর চেহারায় চুমু দিলেন। দুজনেই অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। মা ছিলেন অন্ধ, চোখে দেখতেন না। ছেলেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে নিলেন। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তুমি কী গায়ে দিয়েছ?'

বললেন, 'লোহার বর্ম।'

'বেটা, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য শহীদ হতে চায়, তার এই পোশাকের কী প্রয়োজন! খুলে ফেলো। তাহলে তোমার ক্ষিপ্রতা আরও শক্তিশালী হবে, অস্ত্রচালনা করতে সহজ হবে। বরং তুমি একটা মোটা পায়জামা পরে নাও, যাতে ধরাশায়ী হয়ে গেলেও সতর না খোলে।'

ছেলে চলে গেলেন, এদিকে মা হাত তুললেন আকাশে। 'আল্লাহ, আপনি তার দীর্ঘক্ষণ ইবাদাত-বন্দেগী করার উপর দয়া করুন। অন্ধকার রাতে, মানুষজন

ঘুমিয়ে থাকার সময় তার রোনাজারি করার উপর আপনি রহম করুন। রোজা অবস্থায় মক্কা-মদীনার দ্বিপ্রহরের খরতাপে তার তৃষ্ণা ও ক্ষুধার্ত থাকার উপর আপনি রহম করুন। আল্লাহ! আমি আমার ছেলেকে আপনার হাতে সোপর্দ করে দিলাম। তার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি আমি সন্তুষ্ট আছি। আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন।'

নজীরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শন করে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলেন। তাঁর মরদেহ মক্কার 'হাজুন' পর্বতের সুউচ্চ চূড়ার মতো জায়গায় শূলবিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

জনমে যেমন উচ্চ ছিলেন মরণেও ঠিক উচ্চশির,
ভূষিত ছিলেন বীর অভিধায়, সত্যিকারের মহাবীর।
লোক সমাজে আপনি ছিলেন ইমাম, সবার হক দিশারী,
বাকি তো সবে পেছনে ছিল, নামাযীদের দাঁড়ানো সারি।

৯৭ বছর বয়সী মা পথ হাতড়ে হাতড়ে শূলবিদ্ধ ছেলের লাশের কাছে চলে এলেন, পাহাড়ের চূড়ায়। ছেলের জন্য দুআ করলেন। খুনি হাজ্জাজ সামনে এসে বলল, 'হে আমার মা, খলীফা আমাকে আপনার সাথে সর্বোত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।' আসমা চিৎকার করে বললেন, 'আমি তোমার মা নই। আমি এই শূলবিদ্ধ লোকটার মা। আর (আজকেই শেষ নয়) সব বাদী-বিবাদীরা একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবেই হবে।'

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন। এই বিপদে ধৈর্য ধরুন।' আসমা জবাবে বললেন, 'হে ইবনু উমর, ধৈর্যধারণ কেন করব না? আমাকে তো বনী ইসরাঈলের পাপিষ্ঠদের হাতে নিহত নবী ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া'র মতো একজন নেতা দেওয়া হয়েছে (নিজ ছেলেকে বুঝালেন)।'

পাঠক, দেখুন, কী পরিবার! কত মহান মা, কত মহান ছেলে, কত মহান পিতা! আল্লাহ যাতুন নিতাকাইন রাদিয়াল্লাহু আনহা'র উপর রহম করুন। ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উপর রহম করুন। পিতা যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র উপর রহম করুন। আল্লাহ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি দয়া করুন।

আল্লাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী ও উম্মুল মুমিনীনদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

মায়ের কোল হলো পুরুষ গঠনের কারখানা। মায়েদের পরিশুদ্ধিতে পরিশুদ্ধ হবে প্রজন্ম। তাদের নষ্টামিতে প্রজন্ম হবে নষ্ট। যদি আমরা দৃষ্টান্ত দিতে থাকি, তাহলে মহীয়সী নারীদের এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, পুরুষরা পর্যন্ত যে অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি![১]

۞ চার ছেলের শোকসংবাদে খানসা ﵂-এর ধৈর্য

পাঠক, খানসা ﵂-এর নাম তো সবাই কমবেশ শুনেছি। তিনি বর্বরতার যুগে তাঁর সহোদর ভাই 'সাখর'-কে হারিয়েছিলেন। ভাইয়ের মৃত্যুশোকে তাঁর অশ্রুপ্রবাহ, শোক-মর্সিয়া আবৃত্তি এবং হৃদয়বিদারক চিৎকারে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ইতিহাস আমাদের জন্য সেই কবিতার কিছু পংক্তি সংরক্ষণ করে রেখেছে। কারো বিয়োগব্যথা কাতরতা এবং বিলাপের এক অভিনব পদ্ধতি ছিল সেটি।

সাখর!
বিদীর্ণ সমাধির আহ্বানে যতক্ষণ না এ জগত ছাড়ছি,
ততদিন তোমায় ভুলে থাকার কোনো উপায় নেই।
উদয়ের কিরণে এসে রোজ রোজ জাগিয়ে তোলে তোমার বেদনাস্মৃতি,
এভাবেই দিন শুরু করে প্রতিটি গোধূলি আমার নয়ন জলে ভেজে।
হায়! ভ্রাতৃশোকে কাতর এমন আরো কজন যদি না হতো,
একাকী শোকের সাগরে ডুবে কবেই তো মরে যেতাম!

কিন্তু তিনি মুসলমান হওয়ার পর আমরা তাঁর মাঝে অন্য এক নারীকে দেখতে পেলাম। আমরা দেখলাম, তিনি এমন মা-এ পরিণত হলেন, যিনি তাঁর কলিজার টুকরোগুলোকে অবলীলায় যুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেন। মানে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন সন্তুষ্টচিত্তে, প্রশান্ত হৃদয়ে।

ইতিহাসবিদরা বলেন, সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নেতৃত্বে

[১] আলী আল-কারনী—হা-কাযা আল্লামাতনিল হায়াত—৯১-৯৩

পারস্যের বিরুদ্ধে কাদিসিয়ার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাথে তাঁর চার ছেলেও ছিলেন। যুদ্ধের আগের রাতে তিনি ছেলেদেরকে ডাকলেন। উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধে অটল থাকার উপদেশ দিলেন—

'প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছ। স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই তাঁর কসম! তোমরা একজন আদর্শ পুরুষের সন্তান; যেমন তোমরা একজন ইজ্জতদার নারীর সন্তান। আমি তোমাদের বাবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তোমাদের মামাদের কলঙ্কিত করিনি। তোমাদের বংশকে কলুষিত করিনি। তোমাদের বংশধারা পরিবর্তন করিনি। তোমরা জানো, কাফেরদের মুকাবিলা করার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য কী বিশাল প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তোমরা এটাও জানো, এই অস্থায়ী বাসস্থানের চেয়ে বহুগুণে উত্তম ঐ চিরস্থায়ী আবাস। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> *"হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য ধারণ করো এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।"*[১]

'আল্লাহ চান তো আগামীকাল সকালে তোমরা দক্ষতার সাথে শত্রুদের মুকাবিলায় নেমে যাবে। শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী তো আল্লাহ তাআলা নিজে। যখন দেখবে যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করেছে, প্রতিপক্ষের সেনাপ্রধানকে সাঁড়াশি আক্রমণ করবে। অন্তরে আকাঙ্ক্ষা রাখবে, শাহাদাতের প্রতিদান পাওয়ার মাধ্যমে যেন সকলেই সফলতা অর্জন করতে পারো।'

সকালবেলা চার ছেলে নিঃশঙ্কচিত্তে বীরত্বের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁদের কেউ ক্লান্ত হয়ে গেলে আরেক ভাই বৃদ্ধা মায়ের উপদেশ স্মরণ করিয়ে দিতেন। ফলে ক্লান্তি ঝেড়ে তিনি সিংহের মতো লাফিয়ে উঠতেন। বজ্রের গতিতে সামনে এগিয়ে যেতেন। কচুকাটা করতে করতে সামনে এগোতেন। যেন আল্লাহর

---

[১] সূরা আলি ইমরান, আয়াত-ক্রম : ২০০

শত্রুদের উপর তিনি আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে একে একে চার ছেলেই শহীদ হয়ে গেলেন।

একই দিনে চার বীরসন্তান শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছল বৃদ্ধা মায়ের কাছে। ভাইয়ের মৃত্যুশোকের মতো এবার তিনি নিজ গাল-বুক চাপড়ে, কাপড় ছিঁড়ে, মর্সিয়া গেয়ে শোক করলেন না। বরং ধৈর্যশীলদের ঈমান নিয়ে আর ঈমানদারদের ধৈর্য নিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন এই সংবাদকে। আর বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমার সন্তানদেরকে শাহাদাত কবুল করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী যে, তিনি আমাকে তাদের সাথে তাঁর দয়ার আবাসস্থলে একত্রিত করবেন।'

কোন শক্তি তাঁকে এতটা বদলে দিলো? নিশ্চয়ই সেটি ঈমানের মৃত্যুঞ্জয়ী পানীয়, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢেলে দিয়েছেন মুমিনদের অন্তরে। বর্বরতা আর জুলুমের দুনিয়া সরিয়ে আত্মসম্মানের, মর্যাদার এক পৃথিবী তিনি তাঁদেরকে চিনিয়েছেন। উন্নত চরিত্র এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির আগ্রহের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন জীবনের গতি।[১]

উম্মু উমারাহ ﵂-এর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ

উম্মু উমারাহ নাসীবাহ বিনতু কাআব ﵂-এর আলোচনা আগে কিছুটা করেছি। তিনি আনসারদের খাযরাযী গোত্রীয় প্রখ্যাত মুজাহিদা সাহাবী। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনু কাআব আল-মাযিনী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। এবং তাঁর আরেক ভাই আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত ইবাদাতগুজার ও পরহেযগার সাহাবী। উম্মু উমারাহ 'লাইলাতুল আকাবা'য় উপস্থিত ছিলেন। এরপর থেকে তিনি উহুদ, হুদায়বিয়া, হুনাইন, ইয়ামামা-সহ বিভিন্ন যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেন। আর যুদ্ধের ময়দানেই তাঁর একটি হাত কাটা পড়েছিল।

উহুদের যুদ্ধে নাসীবাহ ﵂ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশপাশে যুদ্ধরত ছিলেন। নবীজির উপর কোনো আঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিলেই তিনি তা প্রতিহত করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি

[১] মাহমুদ আল-মিসরী—ওয়ালা তামূতুন্না ইল্লা-ওয়া আনতুম মুসলিমূন—৭১-৭২

ডান-বাম যেদিকেই তাকাই দেখি সে আমার আশপাশেই যুদ্ধ করছে।'[১] তাঁর দুই ছেলে ও স্বামীও তাঁর পাশে ছিলেন।

তাঁর ছেলে উমারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সেদিন আমি আমার বাম বাহুতে আঘাত পাই। খেজুর গাছের মতো বিশালদেহী এক লোক আমাকে আঘাত করে। পরে সে আর আমার কাছে থামেনি। আমাকে রেখেই চলে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল আমার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "তুমি ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে নাও।" তখন মা আমার কাছে এলেন। তাঁর (কোমরের) দুই পাশে অনেকগুলো পট্টি রাখা ছিল। তিনি সেগুলো মুজাহিদদের ক্ষতস্থানের জন্য নিয়েছিলেন। সেখান থেকে একটি পট্টি খুলে আমার ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলেন। নবীজি তা কাছ থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন।

'পট্টি লাগিয়ে মা (উম্মু উমারাহ) বললেন, "বেটা, যাও, শত্রুদের আঘাত করো।" তখন নবীজি বললেন, "হে উম্মু উমারাহ, তুমি যা করতে সক্ষম, তা আর কে করতে পারবে!"' উম্মু উমারাহ বলেন, 'যে লোকটা আমার ছেলেকে আঘাত করেছিল সে এদিকে আসছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিলেন, "এই লোকটাই তোমার ছেলেকে আঘাত করেছে।"' উম্মু উমারাহ বলেন, 'আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তার পায়ে আঘাত করলাম। সে পড়ে গেল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি হাসছেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত অবধি বেরিয়ে গেল। তিনি বলছিলেন, "উম্মু উমারাহ, চালিয়ে যাও।" তারপর আমরা তাকে আঘাতের পর আঘাত করে হত্যা করে ফেলি। শেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি তোমাকে সফলতা দিয়েছেন। এবং তোমাকে শত্রু থেকে নিরাপদ রেখেছেন। আর তোমার সামনে প্রিয়জনের আঘাতকারীকে উপস্থিত করেছেন।"

নাসীবাহ (উম্মু উমারাহ) ﵂ সেদিন ১৩টি আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর কাঁধে একটি গভীর ক্ষত হয়েছিল। শরীর থেকে অঝোর ধারায় নির্গত রক্তের কোনো তোয়াক্কা তাঁর ছিল না। প্রখর বজ্রের মতো শত্রুদের কাতারে কাতারে ঢুকে হামলা করে যাচ্ছিলেন। তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] ইবনু সাআদ—তাবাকাতুল কুবরা—৮/৩০৩

ওয়াসাল্লাম উমারাহকে লক্ষ করে বললেন, 'তোমার মা... তোমার মা... তার ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরিবারে বরকত দান করুন। তোমার মায়ের মর্যাদা অমুক অমুকের চেয়েও উচ্চে।'

নবীজির এই দুআ শুনে উম্মু উমারাহ নিবেদন করলেন, '(হে আল্লাহর রাসূল) আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমরা জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে পারি।' নবীজি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে জান্নাতে আমার সঙ্গী বানিয়ে দিন।' উম্মু উমারার খুশি তখন দেখে কে! বললেন, 'দুনিয়ার কষ্টে এখন আমার আর কী আসে যায়।'[১]

উম্মু উমারার আরেক ছেলে ছিলেন হাবীব বিন যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ভণ্ডনবী মুসাইলিমার হাতে বন্দী হয়েছিলেন। শয়তানটা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক এক করে কেটে নিচ্ছিল, যেন তিনি মুরতাদ হয়ে যান। কিন্তু তিনি দ্বীনের উপর অটল থেকেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। মা উম্মু উমারার কাছে সন্তান নিহত হওয়ার খবর আসে। তিনি একে মনে করলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সওয়াবের কারণ। আর রক্তশপথ করলেন, তিনি মুসাইলিমাকে হত্যা করবেন। হয় নিজে মরবেন, নয়তো মুসাইলিমা মরবে।

অতঃপর মুসাইলিমার বিরুদ্ধে 'ইয়ামামা'র যুদ্ধে যান। এই যুদ্ধেই মুসাইলিমা নিহত হয়। বার্ধক্যসত্ত্বেও সেখানে বীরোচিত ভূমিকা রেখেছিলেন। যুদ্ধ করতে করতে হাতও কাটা পড়েছিল। হাত কাটা ছাড়াও তিনি আরও ১৪টি আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বেরিয়েই যাচ্ছিল। এভাবেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।[২]

---

[১] ইবনু সাআদ—তাবাকাতুল কুবরা—৮/৩০২-৩০৩

[২] ইবনু সাআদ—তাবাকাতুল কুবরা—৮/৩০৪; যাহাবী—সিয়ারু আলামীন নুবালা—২/২৮১

পাত্র নির্বাচন

ইসলাম যেমন কিছু নীতিমালা দিয়েছে, যার মাধ্যমে একজন যুবক তার অর্ধাঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারে; ঠিক তেমনিভাবে কিছু নীতিমালা দিয়েছে, যেগুলোর আলোকে একজন যুবতী তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে পারে। এবার আমরা সেগুলো আলোচনা করব।

এক. দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়া

একজন যুবতীর উচিত পাত্রের মাঝে সর্বাগ্রে যে গুণটি যাচাই করা, তা হলো দ্বীনদারি। দ্বীনদার ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে। তাঁর আদেশ মেনে চলে। তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তাআলার ভয়ই একজন পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি জুলুম-অবিচার এবং স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত রাখবে। সে স্ত্রীকে ভালো না বাসলেও বিরত থাকবে। আর স্ত্রীকে ভালোবাসলে তো কথাই নেই। স্ত্রী যদি বদমেজাযিও হয়, তবুও স্বামী তার প্রতি জুলুম করবে না। বরং বিভিন্ন পন্থায় তাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে যাবে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধনে সফলতা পাওয়া যায়। কারণ, যে অনুগ্রহ করে, দয়া দেখায়— মানুষ স্বভাবতই তাকে ভালোবাসে ও তার অনুগত থাকে।

রাসূল ﷺ পাত্রীর অভিভাবকদেরকে উপদেশ দিয়ে গেছেন যাতে পাত্রের দ্বীনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করা হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালন, স্ত্রীর অধিকার আদায়, সন্তান প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে ছেলেটি আস্থাভাজন কি না। আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যবহার-আচার, দ্বীনের বিধানাদি মান্য করা এবং পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে প্রতিশ্রুতিশীল কি না। আর এমন দ্বীনদার ও চরিত্রবান পাত্রের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ সতর্ক করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন —

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

'যখন তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তির প্রস্তাব আসে, যার চরিত্র ও দ্বীনদারি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে তোমরা তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও (অন্য কোনো কারণে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না)। বিপরীতটা যদি করো তাহলে পৃথিবীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে।'[১]

পাঠিকা, এই হলো সর্বোত্তম স্বামী, যাকে নবী কারীম ﷺ আপনার জন্য পছন্দ করেছেন। সর্বাগ্রে তাকে হতে হবে দ্বীনদার ও চরিত্রবান। এ-কারণেই নবী কারীম ﷺ বলেছেন, 'তাহলে তাড়াতাড়ি তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।' এখানে আরবী ভাষ্যে 'ফা' অব্যয়টি এসেছে সাথেসাথেই ও তাড়াতাড়ি বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ দ্রুত তার প্রস্তাব গ্রহণ করো। এবং খুব শিগগিরই তা বাস্তবায়ন করে ফেলো। কারণ, এ যুগে এ ধরনের মানুষ পাওয়া খুব দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই, প্রিয় বোন, যদি আল্লাহ তাআলা আপনার কাছে দ্বীনদার ও চরিত্রবান কোনো ছেলেকে উপস্থিত করেন, তাহলে আপনি বুঝে নেবেন মহান রব আপনার কল্যাণের ফায়সালা করেছেন। কারণ, দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলে আপনার হাত ধরে আপনাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে নিয়ে যাবে। আর তার কারণেই আপনি জান্নাতে তার স্ত্রী হবেন। এজন্যই নবী কারীম ﷺ হাদীসের শেষ অংশে বলেছেন, 'যদি তোমরা বিপরীত কিছু করো তাহলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে।'

একজন মুমিনা যুবতী মেয়ে একটা দায়িত্বহীন মন্দচরিত্রের ছেলের অধীনে থাকবে—একজন নারী ও তার সন্তানের জন্য এরচেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে! আপনার আশপাশেই তাকান, দ্বীনদারি ছাড়া আর সবকিছুকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে পাত্র দেখার ক্ষেত্রে। পিতার ঘরদোর-সম্পদ দেখে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে মাদকাসক্তের সাথে। সরকারি উচ্চপদ দেখে মেয়ে দিচ্ছে দুর্নীতিবাজ চোরের কাছে। কেবল দ্বীনদারির কোনো মূল্য নেই, বাকি অর্থ-বিত্ত-চাকরি-পিতা—সবকিছুর মূল্য দেয়া হচ্ছে, মাঝখান থেকে সর্বনাশ হচ্ছে মেয়েগুলোর। এইসব দুনিয়াদার ছেলে মেয়েটির প্রতি অনুগ্রহ করছে না, যৌতুকের জন্য চাপ দিচ্ছে, পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছে, মেয়ের গায়ে হাত তুলছে। যার কাছে আল্লাহ আর

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৯৬৭, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ হাসান লিগাইরিহি। তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১০৮৪, ১০৮৫

রাসূলের কোনো মূল্য নেই, তার কাছে একটা মেয়ের কী মূল্য! দুনিয়ার ভোগের পেছনে যে আল্লাহ-রাসূলের হুকুমকে পদদলিত করে, সে তো আপনাকেও পদদলিত করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। এজন্য বোন, নিজের নিরাপত্তার জন্যই দ্বীনকে প্রাধান্য দিন।

৩০-৪০ বছর একসাথে আপনি কাটাবেন, এই পুরো ৩০-৪০ বছরই ভালোবাসা একই রকম থাকে না। দুনিয়ার স্বার্থ, ভোগের লোভ, দারিদ্র্যে-নষ্ট স্বভাব এসে ভালোবাসাকে ঢেকে ফেলে। আপনাকে সেই আশঙ্কার কথাও মাথায় রাখতে হবে, যদি ভালোবাসা না জন্মে, বা শুরুর উদ্দাম প্রেম যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ছেলেটি কি আপনাকে ছুঁড়ে ফেলবে, জুলুম করবে, কষ্ট দেবে। নাকি আপনার দৈহিক হক, মানসিক হক, আর্থিক হক আদায় করতে থাকবে। কেবল দ্বীন ও আল্লাহ-ভীতি যার মধ্যে আছে, সে এমন অবস্থায়ও আপনাকে নিয়ে ইজ্জতের সাথে সহাবস্থান করবে। 'অভাব যখন দরজা দিয়ে আসে, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়'—কথাটা সত্যি, কিন্তু এটা বেদ্বীনদের সংসারের কথা। আইয়ুব-রাহিমাহ'র সংসার ভাঙেনি, খাদীজাহ-মুহাম্মদের সংসারে জানালা দিয়ে পালায়নি, ফাতিমাহ-আলী'র সংসারে সুখ কমেনি। আলাইহিমুস সালাম আজমাঈন। এজন্য দ্বীনের প্রতি ও সুন্নাতের প্রতি মহব্বতের সকল চিহ্নকে প্রাধান্য দিন। লেবাস-সুরত থেকে নিয়ে নফল আমলের খোঁজ নিন। কুরআনের সাথে কেমন সম্পর্ক বুঝে নিন। ইলমের স্তর ও ইলমের আগ্রহ জেনে নিন। দুনিয়াপরস্তি, লৌকিকতা, অর্থের নেশা, জীবনের উদ্দেশ্য—এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করুন যেদিন আপনাকে দেখতে আসবে। লজ্জায় চুপ থাকলে নিজেই ঠকবেন।

আর একজন পুণ্যবতী নারীর এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে যে, সে একটা ফাসিক স্বেচ্ছাচারী স্বামীর আওতায় থাকবে। সে তাকে বন্ধুদের পার্টিতে যেতে জোর করবে। তাদের সামনে বেপর্দা হতে বাধ্য করবে। মিলনের সময় বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে বাধ্য করবে। হায় আফসোস! কত যুবতী মেয়ে পিতার অধীনে পবিত্রতা ও দ্বীন রক্ষা করে চলে। কিন্তু যখন দ্বীনবিমুখ স্বেচ্ছাচারী স্বামীর ঘরে চলে আসে, তখন সেও হয়ে যায় আত্মমর্যাদাহীন, মন্দ স্বভাবের একজন নারী। আল্লাহ-রাসূলের কোনো মূল্যায়ন তার কাছে থাকে না। আত্মমর্যাদা ও

পবিত্রতার বিষয়ে থাকে না তার কোনো ভ্রুক্ষেপ।

ছেলের পরিবারের খবর নিন। দ্বীনবিমুখ স্বেচ্ছাচার পরিবারের মাঝে যে সন্তানগুলো বেড়ে উঠবে, তেমন ফাসেকী মনোভাব নিয়েই বেড়ে উঠবে। বিশৃঙ্খলা ও পাপাচারকে স্বাভাবিক জেনেই তারা বড় হবে। তবে বহু ছেলে এমন পরিবারে জন্মেও সংগ্রামের সাথে দ্বীনের উপর টিকে আছে। পরিবার এমন-তেমন দেখলেও পাত্রের দ্বীনমুখিতা বুঝে সম্বন্ধ গ্রহণ করা যায়। তাদের দ্বারা হিদায়াত ও সৎকর্মের আশা করা যায়।

সচ্চরিত্র 'দ্বীন'-এরই অংশ হওয়া সত্ত্বেও নবী কারীম ﷺ এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক টিকে থাকার জন্য সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং দ্বীনদারির মজবুতি ও দুর্বলতা সচ্চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে খুব বেশি ইবাদাত-বন্দেগী করে কিন্তু স্বভাবচরিত্রের বেলায় তার ফলাফল শূন্য। এমন হলে সেটা তার প্রকৃত দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দ্বীনদারির দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

নবী কারীম ﷺ বলেন—

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

> *'সর্বোত্তম চরিত্র গঠনের জন্য আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে।'*[১]

অন্য বর্ণনায় আছে —

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

> *'সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।'*[২]

কারণ, নবী কারীম ﷺ আবু জাহাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এক নারীকে বলেছিলেন—

أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، اِنْكِحِيْ أُسَامَةَ

[১] মুসতাদরাকু হাকিম—২/৬৭০ [৪২২১]।
[২] ইমাম বুখারী—আদাবুল মুফরাদ, হাদীস-ক্রম : ২৭৩; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৮৯৫২। সনদ সহীহ।

> *'আর আবু জাহাম তো তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায়ই না। তুমি বরং উসামাকে বিয়ে করো।'*[১]

পাত্রের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তার ক্যাম্পাস ও প্রতিবেশীদের থেকে খবর নেয়া যেতে পারে। গুণ্ডামি-রঙবাজির ইতিহাস থাকলে তা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না।

ইসলাম-বিরুদ্ধ সংস্কৃতি

সাম্প্রতিককালে আমরা অনেককেই দেখি, যদি তার মেয়েকে কোনো যুবক বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে সে যুবককে চরিত্র ও দ্বীনদারির ছাঁচে মাপে না। সে বর্বরতার যুগের ভোগবাদী সংস্কৃতির ছাঁচে মাপতে থাকে; যে সংস্কৃতিতে যুবকের দ্বীনদারি ও আচার-ব্যবহারের কোনো জায়গা নেই। কেবল ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তিকেই গোণায় ধরে। এ কারণেই শুধু উচ্চবিত্ত ও বংশীয় প্রভাবশালীদের হাতেই মেয়েকে পাত্রস্থ করে। যদিও সে ফাসিক বা মন্দ স্বভাবের হোক।

সাহাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম -আচার-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলো?" উপস্থিত লোকেরা বললেন, "সম্ভ্রান্ত লোক। সে যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে। সে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সে যদি কথা বলে তাহলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে।"' সাহাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তারপর রাসূল ﷺ চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর এক মুসলিম দরিদ্রলোক নবীজির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজি বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলো?" উপস্থিত লোকেরা বললেন, "সাধারণ মানুষ। সে যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে না। সে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। সে কথা বললে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে না।"' 'তখন নবী কারীম ﷺ বললেন, "প্রথম ব্যক্তির মতো মানুষ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া থেকে এই সাধারণ ব্যক্তি উত্তম।"'[২]

---

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৪৮০, অধ্যায় : তালাক

[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫০৯১, অধ্যায় : বিবাহ

জুলাইবীব ﷺ-এর ঘটনা

প্রিয় ভাই-বোনেরা, সুন্নত হলো বিবাহের কাজটাকে সহজ করা, এটাকে জটিল করে না তোলা। একই সঙ্গে এটাও সুন্নত, যে, দ্বীনদার ও সচ্চরিত্রবান ছেলের কাছে বিয়ে দেবেন। যদিও সে অর্থ-কড়ির দিক দিয়ে গরীব। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ঈমান থাকে, সেটিই একজন বিচক্ষণ মুমিনকে এরকম ছেলের সাথে বিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। চাই ছেলেটি বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে সুশ্রী না হোক।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী কারীম ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিলেন জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু। দেখতে শুনতে ভালো ছিলেন না। নবী কারীম ﷺ তাঁকে বিয়ে করতে বললেন। তিনি বললেন, "আপনি আমাকে রিক্তহস্তই পাবেন।" নবী কারীম ﷺ বললেন, "কিন্তু তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে রিক্তহস্ত নও।"'[১]

এই সম্মানিত সাহাবী—জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বিয়ের ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ নিজে চেষ্টা-তদবীর করেছেন। আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত, কীভাবে তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসতেন। কীভাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করতেন। কীভাবে অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করতেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যেন আমরা মানুষের কাছে আমাদের মুসলিম ভাইদের বিয়ের জন্য সুপারিশ করি।

আবু বারযাহ আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জুলাইবীব ছিলেন আনসারদের একজন। নবী কারীম ﷺ-এর সাহাবীদের কারো কোনো অবিবাহিতা যুবতী মেয়ে থাকলে তিনি নবীজিকে জানাতেন। তাঁর ব্যাপারে নবীজির নিজের কোনো প্রয়োজন আছে কি না।

একদিন নবী কারীম ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীকে বললেন, 'তোমার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।' তিনি বললেন, 'কতই না চমৎকার কথা! এটা তো সর্বোত্তম নিয়ামত।' নবীজি বললেন, 'আমি নিজের জন্য চাচ্ছি না।' সাহাবী বললেন, 'তাহলে কার জন্য?' নবীজি বললেন, 'জুলাইবীবের জন্য।' সাহাবী

[১] মুসনাদু আবী ইয়ালা—৬/৮৯ [৩৩৪৩]। সনদ হাসান সহীহ।

তখন নিবেদন করলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করে দেখি।'

তিনি মেয়ের মায়ের কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল তোমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।' শুনে মা বললেন, 'চমৎকার। এটা তো সর্বোত্তম নিয়ামত। নবীজির সাথে তার বিয়ে দিয়ে দাও।' সাহাবী বললেন, 'নবীজি নিজের জন্য প্রস্তাব দেননি।'

'তাহলে কার জন্য?'

'জুলাইবীবের জন্য।'

'জুলাইবীবের জন্য! না, আল্লাহর শপথ! জুলাইবীবের সাথে মেয়ে বিয়ে দেব না।'

মায়ের মতামত জেনে মেয়ের বাবা যখন নবী কারীম ﷺ-এর কাছে আসতে উদ্যত হলেন, তখন ঘরের ভেতর থেকে মেয়ে বাবা-মাকে লক্ষ করে বললেন, 'আপনাদের কাছে কে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন?' তাঁরা বললেন, 'নবী কারীম ﷺ।' মেয়ে বললেন, 'আপনারা কার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন, ভেবে দেখেছেন? আমাকে নবীজির হাতে তুলে দিন, তিনি আমার প্রতি অবিচার করবেন না।'

কন্যার বাবা নবী কারীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'তার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আপনি তাকে জুলাইবীবের সাথে বিয়ে দিতে পারেন।'

অতঃপর নবীজি তাকে জুলাইবীবের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

একবার নবীজি ﷺ একটি যুদ্ধে ছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না?' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে হারিয়ে ফেলেছি।' একটু পর তিনি আবার বললেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না?' সাহাবীরা বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে হারিয়ে ফেলেছি।'

কিছুক্ষণ পর নবীজি আবার বললেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না?' সাহাবীরা বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'আমি কিন্তু জুলাইবীবকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা তাকে নিহতদের মাঝে খোঁজো।' সাহাবীরা খুঁজে তাঁকে সাতজন নিহত ব্যক্তির পাশে পেলেন। তিনি তাদেরকে হত্যা করে নিজে শহীদ হয়েছেন।

নবীজি ﷺ বললেন, 'সে আমার অংশ, আমি তার অংশ। সে সাতজনকে হত্যা করেছে, পরে শত্রুরা তাকে হত্যা করেছে? সে আমার অংশ আমি তার অংশ।

সে সাতজনকে হত্যা করেছে, পরে শত্রু তাঁকে হত্যা করেছে? সে আমার অংশ আমি তার অংশ।' নবীজি তাঁকে আপন দুই বাহুতে উঠিয়ে নিলেন। যতক্ষণ সাহাবীরা তাঁর জন্য কবর খনন করছিলেন, তাঁর খাটিয়া ছিল নবীজির দুই বাহু। অতঃপর স্বহস্তে তিনি তাঁকে কবরে রাখলেন।[১]

তাহলে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আমাদের কাছে দ্বীনদার ও সচ্চরিত্রবান প্রমাণিত হবে, আমরা তার সাথে কন্যা বিয়ে দেব। এবং আমরা তার জন্য মানুষের কাছে যাব, যেন তারা তার সাথে বিয়ে দেয়। তার দারিদ্র্য, চেহারার কমতি, সম্ভ্রান্ততা ও বংশীয় মর্যাদার অভাব আমাদেরকে যেন এ কাজে বাধা না দেয়।

তাই মূর্খতার যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি ঝেড়ে ইসলামী পরিবার গঠনের জন্য যত্নসহকারে চেষ্টা করুন। একজন পুণ্যবতী নারী ও পুণ্যবান পুরুষ থেকেই সৃষ্টি হয় একটি ইসলামী পরিবার।

মুসলিম যুবতীর অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি কথা

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম একজন নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে; যাতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কটা ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যুবতী মেয়ের এই অধিকার বাস্তবায়ন করা জরুরি। বুঝবান মেয়ে শুধু ঠুনকো সম্পর্কের কারণে বিয়ের প্রস্তাব মেনে নেবে না। ছেলের সৌন্দর্য-পদ-সম্পদের কারণে ধোঁকা খাবে না।

তাই একজন যুবতীকে সৎ, চরিত্রবান, আচার-ব্যবহারে মার্জিত-ভদ্র, হালাল-হারাম বেছে জীবনযাপনকারী এবং কর্মঠ স্বামী নির্বাচন করতে হবে। এই গুণগুলো হয়তো বাড়ে-কমে, কিন্তু একদম মিটে যায় না। গুণপনা হৃদয়ে সৃষ্টি করে অকৃত্রিম ভালোবাসা। পরিবারে আসে স্থায়ী সুখ-শান্তি।

কবির কথা বড়ই চমৎকার। 'কদাকার অন্তর নিয়ে সৌষ্ঠব চেহারার অধিকারী হওয়া—অগ্নিপূজকের কবরের উপর প্রদীপ জ্বালানোর নামান্তর'।

বর্ণিত আছে, এক আরব নারীকে জনৈক যুবক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই যুবকের সৌন্দর্য নারীকে অত্যধিক আকর্ষণ করেছিল বলে চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের প্রতি মেয়েটি খেয়াল করেনি। তার বাবা অবশ্য তাকে যুবকের

[১] ইবনু হিব্বান—৯/৩৪২-৩৪৫ [৪০৩৫]। সনদ সহীহ।

চারিত্রিক দোষক্রটির কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে পাত্তা দেয়নি। বাবা মেয়েকে এই বিয়ে না করার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন। কাজ হলো না, মেয়েটি সেই যুবককেই বিয়ে করল।

বিয়ের এক মাস পর বাবা এলেন মেয়েকে দেখতে। মেয়ের শরীরে স্বামীর নির্যাতনের ছাপ দেখতে পেলেন। না দেখার ভান করে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিয় বেটি, কেমন আছ?' মেয়েটি ভালো থাকার কথা বলল। তখন বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার শরীরে আঘাতের দাগ কেন?' মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আব্বাজান, আপনাকে আমি আর কীই-বা বলব!'

দুই. পাত্র কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী কারীম ﷺ জনৈক সাহাবীকে কুরআনের জ্ঞান থাকার কারণে বিয়ে করিয়ে দিয়েছিলেন।[১] সুতরাং যাচাই করতে হবে তার ভেতরে কুরআন কতটুকু আছে। কুরআন আছে মানে হিফজ না কেবল, কুরআন থাকা মানে কুরআনের ভালোবাসা থাকা, কুরআনের সাথে সম্পর্ক থাকা। যে কুরআনকে ভালোবাসে, তাকে এই ভালোবাসাই টেনে নেয়। এই ভালোবাসার কারণেই সে কিছু কিছু মুখস্থ না করে পারে না। এই ভালোবাসার কারণেই সে এর অর্থ জানার চেষ্টা বাকি রাখে না। তাফসীর, হাদীস ইত্যাদি কতটুকু পড়েছে, প্রিয় কিতাব কী কী, অতি পরিচিত কিছু আয়াতের তাফসীর, প্রতিদিন তিলাওয়াতের অভ্যাস আছে কি না, নফল আমলের সাথে কেমন সম্পর্ক ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে তার মেজায-মানহাজ-ধারণা আইডিয়া করে নিতে পারেন।

তিন. ছেলে স্ত্রীসহবাস ও বৈবাহিক খরচ বহনে সক্ষম হওয়া

নবী কারীম ﷺ যুবকদেরকে স্ত্রীসহবাস ও বৈবাহিক খরচ বহনের সক্ষমতা-সহ বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ফাতিমা বিনতু কায়িস রাদিয়াল্লাহু আনহাকে

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫১৪৯, অধ্যায় : বিবাহ; মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৪২৫। তবে হানাফী আলিমগণের মতে মোহরানা হতে হবে কোনো বাহ্যিক সম্পদ, যা মানুষের নিকট সম্পদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। -মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ—৩৯/১৫৬। আর বিবাহের সর্বনিম্ন মোহর ১০ দিরহাম। অর্থাৎ দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা বা ৩০.৬১৮ গ্রাম রুপা। আর মোহরে ফাতেমী হলো ৫০০ দিরহাম। অর্থাৎ ১৩১.২৫ তোলা বা ১.৫৩০৯ কিলোগ্রাম রুপা। এক দিরহামের ওজন হলো ৩.০৬১৮ গ্রাম। বর্তমানে প্রতি তোলা রুপার মূল্য ১২০০ টাকা হলে ১০ দিরহামের মূল্য দাঁড়ায় ৩,১৫০ টাকা। আর মোহরে ফাতেমীর মূল্য হয় ১,৫৭,৫০০ টাকা। -শরহু মুখতাসারিত তাহাবী—৪/৩৯৮

বলেছিলেন, '...আর মুয়াবিয়া তো হতদরিদ্র, তার কোনো ধন-সম্পদ নেই।'[১] এগুলো মেয়ের ভাই বা বাবা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। কোনো শারীরিক সমস্যা আছে কি না, একটানা কোনো ওষুধ খায় কি না। ডাক্তারি মতে, পুরুষ যদি মাঝে মাঝে সকালে ঘুম ভেঙে লিঙ্গ শক্ত পায় (morning erection), তাহলেই সে শারীরিকভাবে সক্ষম। লজ্জা না করে এসব পাত্রীপক্ষ থেকে মুরব্বী গোছের কেউ জেনে নিতে পারেন। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্যই হালালভাবে স্বভাবজাত চাহিদা পূর্ণ করা। মূল উদ্দেশ্যই অপূর্ণ রয়ে গেলে তা উভয়ের জন্যই ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

চার. ছেলেটি মেয়ের উপযুক্ত হওয়া বা কুফু

এ উপযুক্ততার কারণ হলো, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবাধ্যতা সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

> *'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ-জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।"*[২]

তাহলে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব দুটো জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব।

এক. স্বভাবগত বিষয়। অর্থাৎ ভেতরগত বিষয়। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ যার মাধ্যমে পুরুষদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। কর্তৃত্বের সকল স্বভাব পুরুষের মধ্যে দেয়া আছে, আর আনুগত্যের সকল স্বভাব নারীর মধ্যে নিহিত আছে। একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য—থেকে বুঝা যায় 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটি সুন্দরভাবে চলতে পুরুষটির বৈশিষ্ট্য নারীর উপর বেশি হওয়া চাই। যদি আসলেই পরিবারে শান্তি চান তবে 'সৌন্দর্য ছাড়া' বাকি দুনিয়াবি বিষয়গুলো—যেমন ধনসম্পদ, আভিজাত্য, শিক্ষাগত ডিগ্রি (জেনারেল/দ্বীনী)—যেন 'আপনার থেকে বেশি' হয়। কেবল **স্বামীর রূপ যেন আপনার থেকে বেশি না হয়।** পরে সমস্যা হতে দেখেছি। আরে, 'তুই তো আরও সুন্দরী মেয়ে পেতি'–এ-জাতীয় কথা স্বামীর মনে জমতে থাকবে আশপাশ থেকে, ভালোবাসা কমবে। বাকি

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১৪৮০
[২] সূরা নিসা, আয়াত-ক্রম : ৩৪

বৈশিষ্ট্যগুলোতে স্বামী যেন আপনার চেয়ে বেশি থাকে। যদি কোনো ডাক্তার মেয়ে সেই হাসপাতালের কোনো পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে বিয়ে করে; নিঃসন্দেহে এটা বৈধ, এর অনুমতি আছে, কিন্তু এ ধরনের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘৃণা, অবাধ্যতা, আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতে থাকবে। সংসার টিকবে না, বা ধুঁকে ধুঁকে টিকবে।

দুই. বহিরাগত বিষয়। সেটি হচ্ছে অর্থ ব্যয় করা। চাই সেটি দেনমোহরের ক্ষেত্রে হোক কিংবা সাংসারিক খরচ বাবদ। তাহলে এই দুটো জিনিসের মাধ্যমে পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবারে পূর্ণতা পায়। যদি দুটোর একটির মাঝে কমতি থাকে তাহলে কর্তৃত্বের বেলায় কমতি হবে। এখনকার যুগে যেটা হচ্ছে, নারী যদি সাংসারিক খরচ বাবদ নিজের অর্থ ব্যয় করে তাহলে নিঃসন্দেহে তারও কর্তৃত্বের একটি দাবি থাকে; সংসারে যার প্রভাব ফুটে ওঠে।

যদি রানি হতে চান, তাকে রাজা বানান, রাজা মনে করুন, রাজার মতো ট্রিট করুন। নিজেকে কোনো অবস্থাতেই স্বামীর প্রতিপক্ষ বানাবেন না। কোনো অবস্থাতেই নিজেকে স্বামীর চেয়ে 'সুপিরিয়র' বা শ্রেষ্ঠ প্রমাণের চেষ্টা করবেন না, যদি সংসার সুখের চান। যদি স্বামী-সোহাগিনী হতে চান, আপনার যোগ্যতা স্বামীর চেয়ে বেশি হলেও নিজেকে ছোট বানিয়ে রাখুন তার সামনে।

বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে 'কুফু' অন্যতম। আরবী 'কুফু' শব্দের অর্থ সমতা, সমান, সাদৃশ্য ইত্যাদি। বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের রুচি, চাহিদা, বংশ, যোগ্যতা—ইত্যাদি সমান সমান বা কাছাকাছি হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় কুফু বলে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের রুচি, চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থান খুব বেশি ভিন্ন হলে সেখানে সুখী দাম্পত্যজীবন প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। একজন এলিট শ্রেণির ছেলেমেয়ের চাহিদা-রুচির সঙ্গে একজন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ের রুচিবোধের মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। আবার একজন দ্বীনদার পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একজন ধর্ম বিষয়ে উদাসীন পাত্র-পাত্রীর জীবনাচার নাও মিলতে পারে। দ্বীনদার চাইবে সবকিছুতে ধর্মের ছাপ থাকুক। আর দ্বীনহীন চাইবে সবকিছু ধর্মের আবরণমুক্ত থাকুক। সুতরাং এ দুইয়ের একত্রে বসবাস কখনো শান্তি-সুখের ঠিকানা হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

> 'তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম নারী গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ রাখো।'[১]

কুফু বা সমতা রক্ষার গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামী আইন-শাস্ত্রের চার ধারার ফকীহগণ একমত। তবে সমতার বিষয়গুলো কী হবে তা নির্ধারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য আছে। হানাফী ফকীহদের মতে যেসব বিষয়ে সমতা রক্ষা করতে হবে তা হলো—ধর্ম, বংশ, স্বাধীনতা, দ্বীনদারি, পেশা ও সম্পদ।[২] কোনো নারী যদি কুফুর প্রতি লক্ষ না রেখে বিবাহ করে তবে তার অভিভাবকের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে।

আল্লামা আবদুল গনী দিমাশকী হানাফী বলেছেন, 'বিবাহে সমতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং যদি কোনো নারী এমন কাউকে বিবাহ করে, যার সাথে তার কুফুর মিল নেই, তাহলে দুই জনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার অধিকার রয়েছে অভিভাবকের।'[৩]

কুফু'র বিষয়টা কেবল মেয়ের দিকে লক্ষণীয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি বিচার্য নয়। অর্থাৎ ছেলেকে মেয়ের সাথে সমতা রক্ষাকারী (মেয়ের উপযুক্ত) হতে হবে। যদি মেয়ে ছেলের সমপর্যায়ের না হয় (ছেলের চেয়ে যোগ্যতায় কম হয়), তাহলে কোনো সমস্যা নেই।[৪]

পাঁচ. এমন ছেলে নির্বাচন করা যে তাকে সতীসাধ্বী রাখবে ও দ্বীনদারি হেফাজত করবে-

অধিক বয়স্ক পুরুষ বিয়ে করা অবৈধ নয়, তবুও অপছন্দনীয়। বিষয়টি হচ্ছে—অল্প বয়সের কোনো যুবতী মেয়েকে ৮০ বছরের দুর্বল বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দিলে তা একদিক থেকে অনুচিত। কারণ এই বৃদ্ধ তাকে সতীসাধ্বী রাখতে পারবে না,

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৯৬৮, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ হাসান গরীব।
[২] রদ্দুল মুহতার—৩/৮৪, দারুল ফিকর
[৩] আল-লুবাব ফী শরহিল কিতাব—৩/১২
[৪] জাদীদ ফিকহী মাসায়েল—৩/৬৭

চাহিদা পূরণে যুবকের মতো হতে পারবে না। তার যৌনাঙ্গের যথাযথ মূল্যায়ন সে করতে পারবে না। আমাদের সামনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ঘটনাটি রয়েছে। নবীজি ﷺ বলেছিলেন, 'সে তো ছোট।' পরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব দেন এবং তাঁর সাথেই বিয়ে হয়।[১]

তবে এই বিষয়টি সব বৃদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনেক বৃদ্ধ আছেন যাঁরা যুবকদের মতো সামর্থ্যবান, অনেক যুবকও তেমন সামর্থ্য আজকাল রাখে না।

ছয়. শারীরিক দোষত্রুটি-মুক্ত ছেলে নির্বাচন করা

প্রথম অধ্যায়ে ১২ নম্বর পয়েন্টে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

নবী কারীম ﷺ বলেছেন—

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ

> *'সিংহ থেকে পলায়ন করার মতো কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করো।'*[২]

বিবাহের আগেই পাত্র-পাত্রীর জন্মগত ত্রুটি থাকলে বা কোনো বড় অসুখ থাকলে তা উভয়পক্ষেরই জানার অধিকার রয়েছে, যাতে পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে কোনো জটিলতা না হয়। কোনো পক্ষই যেন নিজেকে প্রতারিত মনে না করে। অনেক সময় দেখা যায়, বিচ্ছেদ না হলেও মনে অশান্তি নিয়ে, নিজেকে প্রতারিত ভেবে জীবন কাটাতে হয়, যা কাম্য নয়।

সাত. ছেলে সত্যবাদী ও আমানতদার হওয়া-

মাদইয়ান অধিবাসী জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি (শুয়াইব আলাইহিস সালাম)-এর মেয়ের পরামর্শ আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন—

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

> *'নিশ্চয় আপনি যাকে কাজে রাখবেন, তার মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই*

---

[১] নাসায়ী, হাদীস-ক্রম : ৩২২১, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ সহীহ।

[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ৯৭২২। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে ইমাম আহমাদের সনদটি যঈফ হলেও এর সমার্থক সহীহ বর্ণনা রয়েছে। সনদ সহীহ লিগাইরিহি।

সর্বোত্তম।'[১]

মেয়েটি এ-কথা বলার দ্বারা মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। তাহলে পুণ্যবান স্বামীর এটিও একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে, সে হবে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। বরং নবীজি ﷺ-এর সাথে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র বিয়ে হয়েছিল নবীজি সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আম্মাজান খাদীজা নবীজির আমানতদারিতার পরিচয় পেয়েছিলেন।

পাত্রের চাকুরি বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সহকর্মী-কর্মচারীদের কাছে খোঁজ নিলে এ ব্যাপারে জানা সম্ভব।

আট. ছেলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়া

সম্ভ্রান্ত বংশ বলতে কী বুঝানো হয়, সেটা শুরুর দিকে আলোচনা হয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বভাব-চরিত্রের কথা সর্বত্রই লোকমুখে প্রসিদ্ধ থাকে। এ-কারণেই যখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন উম্মু সুলাইম বলেছিলেন, 'তোমার মতো ব্যক্তির প্রস্তাব নাকচ করা যায় না।' [২] সে-সময় আবু তালহা মুসলিম না হওয়া সত্ত্বেও সর্বোত্তম চরিত্রবান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

অনুরূপ নবীজি ﷺ যখন আম্মাজান উম্মু হাবীবাহ রামলাহ বিনতু আবি সুফিয়ানকে বিয়ে করেছিলেন; এবং তাঁর বাবা (আবু সুফিয়ান) বিষয়টি জানতে পারলেন, তিনি তখন কাফির হওয়া সত্ত্বেও বলেছিলেন, 'লোকটি ভালো।'

নয়. পাত্রের অর্থোপার্জন হালাল হওয়া

পাত্রের উপার্জন হালাল কি না যাচাই করা খুব জরুরি। হারাম অর্থ বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে দুআ কবুল হওয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবীজি ﷺ বলেছেন, 'জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে। উসকোখুসকো চুলে ধুলিমলিন চেহারা নিয়ে দুহাত আসমানের দিকে সম্প্রসারিত করে বলে, "আল্লাহ, হে আল্লাহ।" অথচ তার খাদ্য হারাম। তার

[১] সূরা কাসাস, আয়াত-ক্রম : ২৬
[২] নাসায়ী, হাদীস-ক্রম : ৩৩৪১, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ সহীহ।

পানীয় হারাম। তার পরিধেয় বস্ত্র হারাম। তার চতুষ্পদ প্রাণীটিও হারাম। তাহলে কীভাবে তার দুআ কবুল হবে!'[১]

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক ﷺ বলেন, 'সন্দেহের কারণে একটি দিরহাম ছেড়ে দেওয়া আমার কাছে এক লক্ষ টাকা দান করা থেকে উত্তম।' এভাবে তিনি ছয় লক্ষ পর্যন্ত গুণলেন।[২]

উহাইব ইবনুল ওয়ারদ ﷺ বলেন, 'যদি তুমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে (ইবাদাত করতে) থাকো তাহলেও তোমার কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটি লক্ষ না করবে যে, তোমার পেটে হালাল প্রবেশ করল নাকি হারাম।'[৩]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যে ব্যক্তির পেটে হারাম খাদ্য রয়েছে, সে হারাম থেকে তাওবা না করা অবধি আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করবেন না।'[৪]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা হালালের নয়-দশমাংশই ছেড়ে দিতাম হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে (সাবধানতাবশত)।'[৫]

স্পষ্ট হারাম রোজগার প্রমাণ করে পাত্রের হয় দ্বীনী জ্ঞানের স্বল্পতা, নয়তো দ্বীনকে পাত্তা না দেয়া, বা দুনিয়ার লোভ। সুদি ব্যাংকে চাকরি, সুদ নিয়ে ব্যবসা, মানব-রচিত হারাম আইন প্র্যাক্টিস, হারাম আইন অনুসারে বিচারক, নাটক-সিনেমা-মডেলিং, হারাম পণ্যের ব্যবসা (ডিশ, মাদক, দালালি), কুফরের রক্ষক ও কুফরী নীতিমালা বাস্তবায়নকারী বাহিনী বা ক্যাডারের চাকরিতে রত পাত্রের সাথে স্রেফ দুনিয়াবি স্বার্থে মেয়েকে বিবাহ দেয়া বা বিবাহ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

দশ. ছেলে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া

জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এখানে উন্মাদের বিপরীত জ্ঞানী হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, আচার-ব্যবহারে পারঙ্গমতা। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার

[১] মুসলিম, হাদীস-ক্রম : ১০১৫, অধ্যায় : যাকাত
[২] ইবনু আবিদ দুনিয়া—কিতাবুল ওয়ারা'—২০৬
[৩] ইবনু আবিদ দুনিয়া—কিতাবুল ওয়ারা'—১২৩
[৪] ইমাম যাহাবী—কিতাবুল কাবাইর—১২০
[৫] ইমাম যাহাবী—কিতাবুল কাবাইর—১২০

আগে গভীর পর্যবেক্ষণ করা। বিভিন্ন বিষয় ও কাজকর্মে নিবিড় দক্ষতা অর্জিত হওয়া। মন্দ কাজের প্রতিকার সম্পর্কে দক্ষ হওয়া। রাগকে দমন করার মতো সহনশীলতা থাকা। অনাচার-অবিচার প্রতিহত করার মতো ন্যায়বিচার থাকা। মানবিক নানারকম বিষয়ের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই আপনার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত।

এগারো. ছেলে আলিম কিংবা ইলমের প্রতি আগ্রহী হওয়া

মূর্খতা যে-কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। যে স্বামী সুখ-শান্তির পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ, সে তার জীবনসঙ্গিনীকে বৈবাহিক সুখ-শান্তি উপহার দিতে পারবে না। মাদরাসাপড়ুয়াই হতে হবে জরুরি না, ইলমের আগ্রহ রাখে, ইলমের কদর করে, আলিমদের সংস্পর্শে ওতপ্রোতভাবে থাকে—এমন প্রত্যেকেই তালিবুল ইলম।

আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুমাইল ইবনু যিয়াদকে বলেন, 'আমি তোমাকে যা বলি মুখস্থ করে রাখো। মানুষ তিন ধরনের হয়—আল্লাহওয়ালা আলিম, হিদায়াত-প্রত্যাশী, এবং নিকৃষ্ট স্বভাবের।

'নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষ সব ধরনের আহ্বানকারীর পিছেই ছুটে। বাতাস যেদিকে বয়ে যায় তারাও সেদিকে চলে। তারা ইলমের আলোয় আলোকিত হয় না, কোনো শক্তিশালী ভিত্তির কাছে আশ্রয়ও নেয় না।'[১]

তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে–স্বামী বিদ্যার্জন ও দ্বীনী দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকবে। এবং স্ত্রীকেও এ কাজে লিপ্ত রাখবে। দ্বীনের দাওয়াতই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য, পরিবারের ভিত।

ইলমের প্রতি আগ্রহ আছে কি না, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আঁচ করা যেতে পারে।

বারো. ছেলে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হওয়া

যে ব্যক্তি তার পিতামাতার অবাধ্য হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না। এ ধরনের যুবক একজন মুমিন

[১] ইবনুল আসাকির—তারীখু মাদীনাতি দিমাশক—৫০/২৫২

নারীর জন্য নিরাপদ নয়। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকত তাহলে অবশ্যই সে তার পিতামাতার প্রতি সহনশীল হতো। এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় রাখত। যে নিজের মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ না, সে কীভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে?

তেরো. দায়িত্বজ্ঞান, মেজায, আখলাক

খারাশাহ ইবনুল হুর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। উমর বললেন, 'তুমি তো সাক্ষ্য দিলে ঠিক, কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনি না। কাউকে নিয়ে এসো যে তোমাকে চেনে।' উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললেন—

- আমি তাকে চিনি।

- কী জানো তুমি তার সম্পর্কে?

- আমি তাকে নির্ভরযোগ্য ও সদাচারী হিসেবে জানি।

- তুমি কি তার প্রতিবেশী? দিনে-রাতে সে কী কী করে, সব জানো?

- জি না।

- তুমি কি তার সাথে কখনো আর্থিক লেনদেন করেছ?

- জি না।

- কখনও তার সাথে সফর করেছ?

- জি না।

- তাহলে তুমি তাকে চেনোই না।[১]

তিনভাবে মানুষকে চেনা যায়। প্রতিবেশী হলে, আর্থিক লেনদেনে গেলে আর একসাথে সফর করলে। পাত্র সম্পর্কে আপনাকে সবচেয়ে ভালো তথ্য দিতে পারবে তার প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মী এবং ক্রেতা-অংশীদারগণ (ব্যবসায়ী হলে)। আর তার সফরের সঙ্গীরা। পাত্র যদি তাবলীগী হন, তাহলে তার মহল্লার তাবলীগী সাথীদের থেকে ভালো তথ্য মিলবে, যারা তার সাথে সফর করে। বা পাত্রীর বাবা/ভাই ঐ মহল্লার সাথে তিনদিনের জামাতে সময় দিতে পারেন,

[১] ইমাম বাইহাকী—আস-সুনানুল কুবরা—১০/১২৫

যেখানে পাত্র জানবে না যে, এঁরা পাত্রীপক্ষ। দায়িত্বজ্ঞান কেমন, মেজায কেমন, ব্যবহার কেমন, সিফাত কেমন—এগুলো সরেজমিনে জানা যাবে।

পরিশিষ্ট

আমরা যুবকের ক্ষেত্রে যেমন বলেছি, 'হে যুবক, যদি তুমি ফাতিমা ﵂-এর মতো কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাও তাহলে তোমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো হতে হবে।' অনুরূপ আমরা আমাদের সম্মানিত বোনকেও বলব, 'হে বোন, যদি তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো জীবনসঙ্গী চাও তাহলে তোমাকে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র মতো হয়ে যেতে হবে।'

বোন আমার, এগুলো হাতেগোনা কয়েকটি গুণাবলি; একজন পুণ্যবান স্বামীর মধ্যে এ গুণগুলো অবশ্যই থাকতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাও, তাঁর কাছে দুআ করো—যেন তিনি তোমাকে একজন নেককার স্বামীর ব্যবস্থা করে দেন। যে স্বামী তোমাকে হাত ধরে আল্লাহ পাকের জান্নাত অবধি নিয়ে যাবে। আর জেনে রাখো, বৈবাহিক সম্পর্ক একটি নিয়ামত। এই নিয়ামত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ছাড়া আসে না।

নবী কারীম ﷺ বলেন, 'রুহুল কুদুস (জিবরাঈল আলাইহি সালাম) আমার অন্তরে (এ কথা) ঢেলে দিয়েছেন, যে, কোনো ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময় পরিপূর্ণ করার আগে এবং নির্ধারিত রিযিক শেষ করার আগে মৃত্যুবরণ করবে না। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এবং যথাযথভাবে চাও। রিযিক আসতে বিলম্বিত হওয়া যেন তোমাদের কাউকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে রিযিক অন্বেষণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে। কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে তা তার আনুগত্য ছাড়া অর্জিত হবে না।'[১]

[১] মুসান্নাফু আবদির রাযযাক—১১/১২৫; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ—৭/৭৯; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী—৭/২৯৯; হিলয়াতুল আওলিয়া—১০/২৭।

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখা

[১]

প্রথমে পাত্রের মা-বোন-ভাবিরা পাত্রী দেখা উত্তম। নারীদের পর্যবেক্ষণ হয় সবিস্তার এবং খুঁটিনাটি পর্যায়ের। নারীদের স্বভাবগত ইন্টুইশান রয়েছে। ব্রেইনের গঠনগতভাবে মুখভঙ্গি, বাচনভঙ্গির সামান্যতম তারতম্যও তাঁরা ধরতে পারেন। আভাসে অনেক কিছু বুঝে ফেলেন। ফলে ১০টা প্রশ্ন করেও আপনি যা বুঝবেন না, তাঁরা দু-একটা প্রশ্ন করেই ভেতরের খবরসহ সেসব বুঝে নেবেন।

আর বোনেরা খোঁজ নেবেন আপনার হবু শাশুড়ি কেমন মানুষ। যেহেতু ঐ পরিবারে আপনাকে থাকতে হবে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এই খবর বেশ ভালোই পাওয়া যাবে।

[২]

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখার আগেই ইস্তিখারা করা উচিত। পরে করলে একটা বায়াসডনেস কাজ করে, যদি মনে ধরে যায়। জীবনের যেকোনোগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে ইস্তিখারা করা চাই। চাকরি/ব্যবসা/সাবজেক্ট চয়েস/বিয়ে/সন্তানের বিয়ে। নবীজি ﷺ যেমন গুরুত্ব সহকারে সূরা শেখাতেন, তেমনই গুরুত্ব দিয়ে ইস্তিখারার দুআ শেখাতেন।[১] আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের ফয়সালা আসার রাস্তা—ওহী তো বন্ধ, কিন্তু ইস্তিখারা বন্ধ হয় নাই।

ইস্তিখারা

সামনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে কিংবা কোনো বিষয়ে আল্লাহর দিকনির্দেশনামূলক সাহায্য চেয়ে কায়মনোবাক্যে বিশেষ পদ্ধতিতে দুআ করার নাম ইস্তিখারা। অর্থাৎ ইস্তিখারার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করে যে, আমি যা করতে চাই তাতে যদি আমার কল্যাণ থাকে তাহলে তা আমার

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ১১৬২, অধ্যায় : তাহাজ্জুদ

জন্য সহজ করে দিন এবং বরকত দান করুন। আর যদি তাতে কল্যাণ না থাকে তাহলে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন এবং যাতে আমার কল্যাণ তা-ই দান করুন। এটিই হলো ইস্তিখারার সারকথা। ইস্তিখারার জন্য দুটি কাজ করণীয় বলে সহীহ হাদীসে এসেছে। দুরাকাত নামায আদায় করা এবং ইস্তিখারার প্রসিদ্ধ মাসনূন দুআটি মনোযোগের সাথে পড়া। দুআসহ হাদীসটি হলো—

জাবির ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ প্রত্যেক কাজে ইস্তিখারা করা বিষয়ে আমাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেভাবে কুরআনের সূরা শেখাতেন। তিনি বলতেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন সে দুরাকাত নফল নামায আদায় করবে, এরপর পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرًا لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ، اَللّٰهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ ، فَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ واصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহের কিছু চাই। কেননা আপনিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়াদির সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করবে) আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দিন, তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর এই কাজটি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি

> *আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।* [১]

সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে এই দুটি কাজ সম্ভব না হলে তিনবার বা সাতবার এই দুআ পড়েও ইস্তিখারা করা যায়—

'اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ وَاخْتَرْ لِيْ'

> *'আল্লাহ! আমার জন্য (যা) কল্যাণকর, (সেটাই) নির্ধারিত ও নির্বাচিত করে দিন।'* [২]

অতঃপর যে বিষয়ে অন্তর পরিতৃপ্তি লাভ করবে, আল্লাহর উপর ভরসা করে সেই কাজ শুরু করুন।

কিন্তু অনেকে মনে করেন, ইস্তিখারার জন্য ঘুমাতে হয় কিংবা রাত্রি বেলায় ঘুমানোর আগেই শুধু ইস্তিখারা করা যায়। এটা ঠিক না, রাত বা দিনের যেকোনো সময়েই করা যায়। এই আমল করার জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারিত নেই।

আবার অনেকে মনে করেন, স্বপ্ন দেখলেই ইস্তিখারা পূর্ণ হবে। স্বপ্ন দেখবেন এটা জরুরি না, তবে কোনো একদিকে মন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঝুঁকে পড়বে, পজিটিভ বা নেগেটিভ। [৩]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হবে না, যে স্রষ্টার নিকট ইস্তিখারা করে এবং মানুষের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় ও এর উপর অটল থাকে।'

[৩]

মেয়ের সকল তথ্যাদি, মা-বোনের রিপোর্ট, ইস্তিখারার রেজাল্ট, মেয়ের পরিবার-আত্মীয় সম্পর্কিত ডেটা নিয়ে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কোনো আলিমের সাথে পরামর্শ করুন। ওহীর অবর্তমানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের ফায়সালার

---

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম: ১১৬২; তিরমিযি, হাদীস-ক্রম: ৪৮০

[২] ইবনুস সুন্নী, হাদীস-ক্রম : ৫৯৭, ৫৯৮; ইমাম মারূযী—মুসনাদু আবি বকর—৪৪

[৩] মাসিক আল-কাউসার থেকে সংগৃহীত

জন্য নবীজি আমাদের দুটি জিনিস শিখিয়েছেন—ইস্তিখারা ও পরামর্শ। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ আলিমের ইশারায় কাজে কনফিডেন্স পাবেন। আলিম না পেলে অভিজ্ঞ কোনো নেককার বয়স্ক মুরব্বীর সাথেও পরামর্শ করতে পারেন, যিনি আলিমদের সাথে সম্পর্ক রাখেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীস—

> *'যে লোক কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে এবং পারস্পরিক পরামর্শ করার পর তা বাস্তবায়ন করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সঠিক ও লাভজনক দিকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়।'*[১]

রাসূল ﷺ বলেন–

> *'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তবে আল্লাহ একে আমার উম্মতের জন্য রহমতের বস্তু বানিয়েছেন। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে, সে সোজা পথের উপর থাকে। আর যে পরামর্শ করে না, সে চিন্তাযুক্ত থাকে।'*[২]

[৪]

পাত্রের বাবা-চাচা-মামারা পাত্রী দেখতে যাবার একটা বাজে কালচার আছে আমাদের সমাজে। বিয়ের পর পাত্রের বাবা মেয়ের মাহরাম হবেন, এর আগে না। সুতরাং এভাবে পাত্রপক্ষের পুরুষ লোকেরা পাত্রীকে দেখা নাজায়েয ও পর্দার খেলাফ। একজন দ্বীনী বোনের পর্দা যেন নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারটাও পাত্র খেয়াল রাখবেন।

[৫]

পাত্রের মাহরাম নারী (মা/বোন) কিংবা মেয়ের মাহরাম পুরুষের (ভাই) উপস্থিতিতে পরস্পরকে দেখবে, একাকী নয়। নবীজি তাগিদ দিয়েছেন বিয়ের আগে পরস্পরকে দেখার ব্যাপারে। তিনি বলেছেন—

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى

[১] ইমাম বাইহাকীর শুআবুল ঈমান সূত্রে মাআরিফুল কুরআন—২/১৯১
[২] বাইহাকী—৭৬/৬

نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

> 'তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে তখন সম্ভব হলে তার এমন কিছু যেন দেখে নেয় যা তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে।'[১]

মুগীরা ইবনু শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈকা নারীকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। এ কথা জানতে পেরে রাসূল ﷺ বলেন—

انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

> 'তুমি আগে তাকে দেখে নাও, এটা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি করবে।'[২]

অতঃপর তিনি তাই করলেন এবং ওই নারীকে বিবাহ করলেন। মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার এই স্ত্রীর সাথে আমার প্রেম-ভালোবাসা ছিল সবচেয়ে বেশি।'

[৬]

পাত্র একজন মুসলিমার প্রাপ্য সম্মান বজায় রেখে কথা বলবেন। এমন কোনো প্রশ্ন করবেন না যাতে সে আহত হয়/লজ্জা পায়। কঠোর কোনো দাবি করবেন না যে, 'বিয়ের পর এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, রাজি আছ কি না'। অবশ্যই 'আপনি' সম্বোধনে কথা বলা উচিত।

এ সময়টায় লজ্জা না পেয়ে খোলাখুলিভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নেয়া দরকার। পাত্রী যদি লজ্জা পায়, তবুও পাত্রের উচিত নিজের ব্যাপারে আনুষঙ্গিক তথ্যগুলো দেয়া। ধরুন, জিজ্ঞেস করলেন, 'জুমার দিন সূরা কাহফ পড়া হয় কি না।' তিনি বললেন, 'মাঝে মাঝে হয়।' তখন আপনিও বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আমারও হয় এভাবে।' ফলে মেয়েসুলভ আড়ষ্টতা সত্ত্বেও তিনি আপনার সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন, যা তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলাপ হতে পারে। ইন্টারভিউ নিতে লেগে যাবেন না, নিজের উত্তরটা বলে এরপর তাঁরটা জানতে চাইবেন।

---

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২০৮২, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ হাসান।

[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১০৮৭, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ হাসান।

- ☑ বিয়ে কেন করছেন?
- ☑ মাহরাম নন-মাহরাম মেনে চলেন?
- ☑ এই মুহূর্তে আপনার অভিভাবকেরা আপনাকে বিয়ে দিতে চান কি না, বোরকা পরেন কি না (নিকাব-সহ, নাকি নিকাব-ছাড়া)
- ☑ ভবিষ্যতে চাকরি করতে চান কি না টিভি দেখেন বা গান শোনেন?
- ☑ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলওয়াত করতে পারেন?
- ☑ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন কি নাপ্রিয় আলিম কে কে?
- ☑ বিয়ের পর পড়াশোনা বা চাকরি চালিয়ে যেতে চান কি না
- ☑ দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন কি না
- ☑ কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে, বড় কোনো সূরা মুখস্থ আছে কি না, সপ্তাহে সোম-বৃহস্পতি রোযা রাখা হয় কি না
- ☑ নফল সালাতের মধ্যে কোনোটা পড়া হয় কি না; তাহাজ্জুদ বা ইশরাক?
- ☑ জুমার দিন সূরা কাহফ পড়া হয় কি না

বোনেরাও এইসব প্রশ্ন করে পাত্রের দ্বীনদারি যাচাই করে নিতে পারেন। আর আগেই পাত্রের কাছে আলাদা সংসার দাবি করবেন না। 'আলাদা সংসার' একটা ২২-২৫ বছরের ছেলের পক্ষে কীভাবে দেয়া সম্ভব? তা পেতে হলে আপনাকে ৩২-৩৫ বছরের পাত্র খুঁজতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে আগে আগে বিয়ে করার এক নীরব আন্দোলন শুরু হয়েছে প্র্যাক্টিসিং মুসলিম ভাইদের মাঝে। অহেতুক দাবি করে এই আন্দোলনটাকে থামিয়ে দেবেন না। সময় হলে সব পাবেন, ততদিন সবরুন জামিল।

[৬]

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে পছন্দ হলে অভিভাবকদের দ্রুত জানানো উচিত। প্রতিটা মানুষই সামগ্রিকভাবে সুন্দর। একটা কমতি পূরণ করে দেয় আরেকটার বাড়তি। ‘রূপ+কথা+দ্বীনদারি+স্বামীকে নিয়ে স্বপ্ন’—সব কিছু মিলিয়েই একজন মেয়ে সুন্দর। শুধু রূপসী বহু পাবেন, যাদের বাকিগুলোতে ভয়ানক কমতি আছে। তাই ওভারঅল নিয়ে চিন্তা করে সামগ্রিক সিদ্ধান্তে আসুন। বোনদের ক্ষেত্রেও তাই। একজন স্বপ্নবাজ আলিম বা পরিবারের সাথে সংগ্রাম করে দ্বীনের উপর চলা পাত্র হয়তো আপনাকে বৈষয়িক আরাম-আয়েশ ও বিলাসদ্রব্য দিতে পারবেন না, কিন্তু তিনি আপনাকে নিয়ে জান্নাতের পথে চলতে পারবেন, পরস্পরের সহযোগী হিসেবে। আপনাকে নিয়ে দ্বীনের খিদমাতের এমন রাস্তায়ই তিনি চলবেন, যাতে সহায়তার দ্বারা আল্লাহর কাছে আপনার মর্যাদাও বাড়তে থাকবে।

[৭]

বিবাহ তকদীর-নির্ধারিত বিষয়, আসলে তকদীরের বাইরে তো কিছুই না, তবে হাদীসে স্পেশালি বিয়ের কথা এসেছে। পাত্র-পাত্রীর পরস্পরকে ভালো না-ই লাগতে পারে। অভিভাবকেরা ডিপ্লোমেটিক্যালি জানিয়ে দেবেন। এখানে কারও কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই, সবার নসীবে সবাই নেই। আসল জনের জন্য দুআ করা থামাবেন না।

[৮]

আর পছন্দ হয়ে গেলে অহেতুক দেরি করতে নবীজি নিষেধ করেছেন। যে-কারো দিল ঘুরে যেতে পারে। তাই দ্রুত তারিখ ঠিক করার চেষ্টা করুন। আলী ইবনু আবি তালিব ﵁-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর রাসূল — বলেছেন —

يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا »

> *‘আলী! তিনটি ব্যাপারে দেরি করো না—(১) নামায, যখন তার ওয়াক্ত আসে; (২) জানাযা, যখন উপস্থিত হয় এবং (৩) বিবাহযোগ্য নারী, যখন তুমি তার উপযুক্ত (পাত্র) পাও।’*[১]

---

[১] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১৭১, অধ্যায় : নামায; ইমাম বাগাবী—শরহুস সুন্নাহ—২/১৯১। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে হাদীসটি হাসান।

[৯]

পছন্দের পর বিয়ের আগে মেয়ের সাথে আবার দেখা করা তো দূর কি বাত, ফোনে গল্পগুজবও জায়েয নেই। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, দ্বীনহীন লোকেরা তো বটেই, অনেক সময় দ্বীনদার লোকজনও এই বিষয়টিতে ভুল করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন—বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়ার পর এখন আর কথা বলতে কোনো বাধা নাই। এটি সম্পূর্ণ রকমের বিভ্রান্তি। মনে রাখবেন, 'বিয়ে ঠিক হওয়া' মানে 'বিয়ে হয়ে যাওয়া' না। যতক্ষণ না বিয়ে হচ্ছে, ততক্ষণ তারা উভয়ে একে অপরের জন্য গাইরে মাহরাম। বিয়ের পরই কেবল একে অন্যের মাহরামে পরিণত হবে। তাছাড়া বিয়ে ঠিক হওয়ার পর সেটা ভেস্তে যাওয়ার উদাহরণও কম নয় সমাজে। তাই এই বিষয়ে সতর্কতা কাম্য।

নিকাহ

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যাবার পর আপনাকে কঠোর কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটা সম্পর্কের শুরুটা আল্লাহর নারাজি দিয়ে শুরু করা মোটেও সমীচীন হবে না। সুন্নাতের খেলাফ কাজ করে, আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে যে সম্পর্কের শুরু, তা বারাকাহ-সমৃদ্ধ হবে কীভাবে। মন-খুশি বিয়ে যারা করে, তারা মনকেই কেবল খুশি করে—হৈহুল্লোড়, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, গায়ে হলুদ, ডিজে-ডান্স, সাউন্ড সিস্টেম, লৌকিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। মনে রাখবেন, আপনি করছেন আমল, আল্লাহর খুশির জন্য। শুরুতেই ছাড় দেবেন না। নিজের পরিবার, হবু স্বামী/স্ত্রীর পরিবারের কাছে স্পষ্ট করে দিন—বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার চাওয়া-পাওয়া। **বিশেষ করে পাত্রী দাবি তুললে ছেলেটার দাবিও জোর পাবে—'আমাদের বিয়েতে ওসব হবে না, ব্যস।' আর পাত্রী দাবি না জানালে পাত্র বেচারাকে অনেক লড়তে হবে, হেরেও যেতে পারে।**

ক. গায়ে হলুদ:

গায়ে হলুদ এবং বাগদান (এনগেজমেন্ট) যে হিন্দু সংস্কৃতি থেকে প্রবিষ্ট, তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে তুলে দিচ্ছি—

গায়ে হলুদ হিন্দু বিয়ের অন্যতম একটি রীতি। মুসলমান বিয়েতেও এর চল আছে। জানেন কি, বিয়ের অনুষ্ঠানে গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে হলুদের প্রচলন কেন হলো? হিন্দু বিয়ের রীতি অনুযায়ী, বিয়ের দিন সকালে হলুদ মেখে স্নান করেন বর-কনে। পুরাণেও হিন্দু বিয়ের রীতিতে হলুদের চল ছিল।[১]

বাংলাপিডিয়া জানাচ্ছে, এর সাথে মঙ্গলের কুসংস্কারও জড়িয়ে আছে—

বর-কনের দাম্পত্য জীবনকে যেকোনো ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তির

[১] নিজস্ব প্রতিবেদন (১৬ জানুয়ারি, ২০১৯), বিয়ের রীতিতে গায়ে হলুদের চল কেন এল জানেন? আনন্দবাজার পত্রিকা, অনলাইন সংস্করণ।

অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকেই এসব লোকাচার পালন করা হয়। গায়ে হলুদ এ সবেরই একটি এবং এটি মূলত একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। হিন্দুসমাজে এ লোকাচার গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস নামে অভিহিত। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ের তিনদিন, পাঁচদিন অথবা সাতদিন আগে বর ও কনের গায়ে হলুদ এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য মাখানো। হলুদ একদিকে পবিত্রতার প্রতীক, অন্যদিকে প্রসাধনী হিসেবেও উৎকৃষ্ট। আধিভৌতিক ও অপশক্তির প্রভাব দূর করতে হলুদ অত্যন্ত কার্যকর বলে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এসব কারণেই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে।[১]

এ ধরনের শিরকী অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক একটি লোকাচার দিয়ে আপনি কীভাবে আপনার নতুন জীবন শুরু করতে পারেন? সেই সাথে গাইরে মাহরামের ইনভলভমেন্টে ফরয পর্দা নষ্ট হওয়া থেকে নিয়ে ফটোগ্রাফি, ডান্স, ডিজে, লোকদেখানো অহেতুক খরচ, ফ্রিমিক্সিং—অনেকগুলো হারাম কাজের উপলক্ষ এই গায়ে হলুদ ও বাগদান। তাহলে কীভাবে এই বিয়েতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ, সাহায্য ও সুখশান্তি আশা করা যায়?

অনেকে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বিয়ের ঘটনা থেকে 'গায়ে হলুদ' ইসলামেও রয়েছে প্রমাণ করতে চান। ঘটনাটি হলো—

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবদুর রহমান ইবনু আউফের সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর দেহে হলুদ সুগন্ধির চিহ্ন ছিল। রাসূল ﷺ বললেন, 'কী ব্যাপার আবদুর রহমান ! তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূল ! আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি।[২]

এটা হলুদ ছিল না, এটা ছিল জাফরান। একই ঘটনা মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে[৩], সেখানে 'জাফরান' শব্দটির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর জাফরান রঙ ছেলেদের ব্যবহার নিষেধ ছিল। সুতরাং নববধূর শরীর থেকে সাহাবীর

[১] শাহীদা আখতার, গায়ে হলুদ, বাংলাপিডিয়া (বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ)

[২] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৩৯৩৭

[৩] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৩৮৯০

শরীরে তা লেগেছিল। আর হলুদ যেমন অশুভ থেকে মঙ্গলের জন্য ব্যবহার হতো, জাফরানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কেবলই সৌন্দর্যের জন্য, যার তুলনা হতে পারে মেহেদী। সুতরাং শিরকের নির্যাস এই 'গায়ে হলুদ'-এর সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আলিমগণের বিস্তারিত মতামত জানতে মুফতী হাফিজুর রহমান সাহেবের গায়ে হলুদ বনাম ইসলামী রীতি আর্টিকেলটি দেখতে পারেন।[১]

খ. বিয়ে মসজিদে

মুসলমানের বিয়ে-শাদি, বিচার-সালিশ, শিক্ষাদীক্ষা—সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডের মারকায বা কেন্দ্র হবে মসজিদ। আজ আমাদের সাথে মসজিদের কত দূরত্ব। মসজিদের নাম আজ কেবলই 'নামায-ঘর'। এজন্যই আমাদের জীবনে বারাকাহ নেই।

মুসলমানের বিয়ে মসজিদে হওয়া উচিত। সুন্নাহ এটাই।

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা ﵂ সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা বিয়ের ঘোষণা দেবে, বিয়ের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে এবং এতে দফ বাজাবে।'[২]

কনের বাবা মেয়ের অনুমতি নিয়ে মসজিদে যাবেন। ছেলের কাছে প্রস্তাব পেশ করবেন ইমাম সাহেব। ছেলে জোরে বলবেন, 'আলহামদুলিল্লাহ আমি কবুল করলাম।' ব্যস, আল্লাহর খাতায় আপনারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী।

খেজুর ছিটানো সুন্নাহ। ফাতিমা ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র বিবাহের খুতবার পর একপাত্র খুরমা উপস্থিতদের মাঝে ছিটিয়ে দেয়া হয়। কারো বর্ণনায় উপস্থিতদের মাঝে মধুর শরবত ও খেজুর বণ্টন করা হয়েছিল। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি ﷺ সেখানে খুরমা বণ্টন করেছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করেই কোনো কোনো ফকীহ বিবাহের সময় খুরমা/বাদাম/চিনি ছিটানোকে মুস্তাহাব বলেছেন।[৩] যেহেতু বিয়ে একটা আনন্দের উপলক্ষ, নবীজি ছিটিয়ে দিতে

[১] মুফতী হাফিজুর রহমান (November ৬, ২০১৮), গায়ে হলুদ বনাম ইসলামী রীতি, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া।

[২] তিরমিযী, হাদীস-ক্রম : ১০৮৯, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ দুর্বল।

[৩] সীরাতু ফাতিমাতিয যাহরা—৯১-৯৩

বলেছেন, সবাই লাফিয়ে ধরবে। এটা মসজিদের আদবের খেলাফ না। নবীজি যা বলেছেন ওটাই আদব। ভেজা ভেজা আঠালো খেজুর নেবেন না, খোরমা নেবেন, তাহলে ছিটালে মসজিদ ময়লা হবে না। ইমাম সাহেবের অনুমতি নিয়ে রাখবেন, অনুমতি না দিলে দরকার নাই।

গ. কাবিন ও তালাকের অধিকার

কাবিননামা দ্রুত করে ফেলবেন। এখন আমাদের ঈমান দুর্বল, তাকওয়ার অভাব। কাবিন, রেজিস্ট্রি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য। ছেলে কিছুদিন সংসার করে পালিয়ে গেল। বা লজ্জা ভুলে বেহায়ার মতো অস্বীকার করল। তখন? আপনি যেন আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন, বিচার পান। এজন্য বিয়ের মজলিসেই, না হয় পরে যত দ্রুত সম্ভব কাবিন-রেজিস্ট্রি করে নেয়া উচিত। কাবিননামার ১৮ নম্বর ঘরে 'স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিচ্ছেন কি না'—এখানে 'না' লিখুন। বিয়ের আগেই তালাকের অধিকার দিলে তা 'দেওয়া' হয় না। আলিমগণ এটা নিষেধ করেন। আবার কিছু মূর্খ কাযী লিখে দেয় 'বনিবনা না হলে'। বনিবনা না হলেই স্ত্রীর আমাকে তালাক দেবার অধিকার থাকবে? মাঝে আর কোনো ধাপ নেই? যত্তসব! একটা জীবনের শুরুতেই নিয়ত যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে ফলাফলও তেমনই হবে। নিয়ত করুন—জান্নাতেও দুজনে একসাথে থাকবেন। তালাকের কথা মাথায়ই আনবেন না।

ঘ. বরযাত্রী

কনেপক্ষের উপর আয়োজনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। '৫০০ বরযাত্রী আসছি' আগাম জানিয়ে ব্যবস্থা করতে বলা নিকৃষ্ট ছোটলোকি। আপনার আত্মীয়-স্বজনকে আপনি খাওয়াবেন, আপনার পয়সা নেই? তারপর এসে খাবার নিয়ে সমালোচনা, গেট ধরা, শ্যালিকা হাত ধুয়ে দেয়া—এসব কু-প্রথার অনুমোদন ইসলামে নেই। যদি নতুন জীবনে বারাকাহ চান, আল্লাহর সাহায্য চান—এসব লোকদেখানো, লোকের মন জয় করার নামে জুলুম বাদ দিতে হবে। আপনার স্ত্রীকে আপনার দোযখ বানিয়ে দিতে আল্লাহর এক মিনিটও লাগবে না। নবীজি ﷺ নিজের মেয়েকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরে দিয়ে আসেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে দিয়ে আসেন আম্মাজান আয়েশাকে।

উত্তম তো মেয়ের বাড়িতে খানাপিনা হবে না, কনের বাবা গিয়ে কনেকে দিয়ে আসবে। একান্তই মেয়ের বাবা লৌকিকতার তাগিদে খানাপিনার চাপাচাপি করলে সর্বোচ্চ ১০ জন গিয়ে খেয়ে মেয়ে নিয়ে আসবেন। বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়া এবং কনেপক্ষের বাড়িতে আপ্যায়ন যদি তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও সন্তুষ্টিতে হয় তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিষয়টি খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। কনেপক্ষের উপর জোর করে বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমাজ রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হয়। আবার বরপক্ষের কিছু মূর্খ, নাদান, খাদক ও ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি সেই খাবারে নানা খুঁত ধরে অপমানের চেষ্টা করে থাকে। এধরনের পরিস্থিতিতে বরযাত্রী হিসেবে খাবার খাওয়া জায়েয নয়।[১]

রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

> ***'কোনো মুসলমানের আন্তরিক সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ (ভক্ষণ) হালাল নয়।'***[২]

মোটকথা, আমাদের শরীয়তে মেয়ে বিয়ে দিতে মেয়ের বাবার কোনো খরচ নেই। মোহর, ওয়ালীমা—সব ছেলেপক্ষের খরচ। ইসলামে মেয়ে পিতার জন্য বারাকাহ। আর আমরা হিন্দুয়ানি প্রথা ঢুকিয়ে মেয়েকে পিতার জন্য বোঝা বানিয়ে দিয়েছি। এজন্য লোকে দারিদ্র্যের ভয়ে জাহিলিয়াতের যুগের মতো এখনও কন্যা-ভ্রূণ হত্যা করে। ইসলাম সহজ করেছিল, আমাদের মন-চাহিদাই তা কঠিন করে ফেলেছে।

ঙ. ওয়ালীমা ও পর্দা

বিয়ের পর ছেলে কর্তৃক আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গরীব-মিসকীনদের তৌফিক অনুযায়ী আপ্যায়ন করাকে 'ওয়ালীমা' বলে। বাংলায় ওয়ালীমাকে 'বৌভাত' বলা হয়, যদিও বৌভাত মানে 'বৌ কর্তৃক রান্না'। হিন্দু সমাজে ওইদিন নববধূকে প্রথম রান্নাঘরে নেওয়া হয় এবং তার হাতের স্পর্শযুক্ত

---

[১] ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ—৭/৫২২

[২] বাইহাকী—আস-সুনানুল কুবরা—৬/১৬৬ [১১৫৪৫]। সনদ হাসান লিগাইরিহি।

রান্না খাইয়ে তাকে বরের সমাজভুক্ত করা হয়, এজন্য বলে 'বৌভাত'। হিন্দুয়ানি পরিভাষার পেছনে বিশেষ সংস্কার-অন্ধবিশ্বাস জড়িত। তাই আমাদের উচিত মুসলিম সংস্কৃতির পরিভাষাগুলোকে সংরক্ষণ করা। ওয়ালীমা আমাদের সুন্নাহ ইবাদাত।

বিয়ের পরদিন বা পরবর্তী সময়ে সুবিধামতো নিকটতম সময়ের মধ্যে ওয়ালীমা করা চাই। তবে তিন দিনের মধ্যে করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ওয়ালীমা করেছেন এবং সাহাবীদেরকে ওয়ালীমা করতে উৎসাহিত করেছেন। নবীজি যাইনাব বিনতু জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পরদিন ওয়ালীমা করেছেন।[১] ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পরও তিন দিন যাবত ওয়ালীমা খাইয়েছেন।[২]

আমাদের কমিউনিটি সেন্টার কালচারে শুধু ধনী ও দুনিয়াদার আত্মীয়স্বজন দাওয়াত পায়। এই ওয়ালীমাকে হাদীসে নিকৃষ্টতম ওয়ালীমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবীজি ﷺ বলেছেন, 'ঐ ওয়ালীমার খাবার নিকৃষ্ট, যার মধ্যে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, আর গরীব লোকেদের বাদ দেয়া হয়।'[৩]

ওয়ালীমাতে নারীপুরুষের আলাদা ব্যবস্থা হবে। কনে পর্দার সাথে থাকবেন। নন-মাহরাম কেউ কনে দেখবেন না। কনের ছবি কেউ তুলবেন না, ভেতরের মহিলারাও না। বদদ্বীন মহিলারাও ছবি তুলে স্বামীকে গিয়ে দেখায়। নতুন জীবনের শুরুতেই ফরযের সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না। কমপক্ষে নিজের ও নিজের স্ত্রীর পর্দা রক্ষায় কঠোর থাকুন। **মানুষকে নয়, আল্লাহকে খুশি করুন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করবেন।**

ওয়ালীমাতে উপহার সামগ্রী গ্রহণ

বরযাত্রীর আলোচনায় উল্লিখিত হাদীসে রয়েছে যে, অসন্তুষ্টির সাথে মুসলমানের সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। একই হাদীসের আলোকে ওয়ালীমা-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার-সামগ্রী গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন, চেয়ার-টেবিল বসিয়ে আলাদা লোক নিযুক্ত করে আগত মেহমানদেরকে উপহার দিতে বাধ্য

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫১৭০
[২] মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাদীস-ক্রম : ৩৮৩৪
[৩] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৫১৭৭, অধ্যায় : বিবাহ

করা জায়েয নয়।[১]

চ. যৌতুক

কনেপক্ষ থেকে অলংকারের শর্ত করা নিষেধ এবং ছেলেপক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম।[২] আগেই বলেছি, মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাবার কোনো খরচ ইসলাম রাখেনি। খবরদার! শ্বশুর জামাইকে হাদিয়া দিবে ভালো-কথা, এজন্য সারা জীবন পড়ে আছে। বহুত হাদিয়া দেবে। জাস্ট বিয়ের সময় নেবেন না। এমনকি বরের বাসায় কাপড়চোপড় পাঠানো, তা নিয়ে আবার ছেলেপক্ষের নারীদের গীবতের মজমা বসে—'কী সস্তা জিনিস দিছে!'

আপনি একটু কঠোর হলে কত গুনাহ রোধ করতে পারেন!

অনেকে যৌতুক নেন না ঠিকই, আবার বউকে কথাও শোনান। বরযাত্রী যান না, আবার শাশুড়ি বউকে খোঁটাও দেন—'তোমার বাপের তো কোনো খরচই হয়নি, খালি মেয়েটা দিয়েই খালাস।' অনেকসময় এই খোঁটার ভয়েই মেয়ের বাপ বড় অনুষ্ঠান করতে কিংবা যৌতুক দিতে চায়। মুসলিমকে এইভাবে খোঁটা দেয়া/উপহাস করা ভয়াবহ রকমের কবীরা গুনাহ। তাওবা ছাড়া মাফ না হবার আশঙ্কা আছে।

কিছু বিষয়ে আল্লাহর জন্য কঠোর হয়ে যেতে হয়। যারা বেজার হবে, তাদের খুশি করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। আপনার কাজ শুধু আল্লাহকে খুশি করা। যত পরিমাণ সুন্নাহর উপর আমল হবে ধরে নেবেন আপনার দাম্পত্য-জীবন তত সুখের হবে, ইনশাআল্লাহ।

ছ. মোহর

আমার আগে ১ জন মাত্র রাবী, সহীহ সনদ। মেয়ের বাবা মোহর চেয়েছেন ৪০ লাখ টাকা। কেন? 'আমার মেয়েকে যদি ছেলে ছেড়ে দেয়!' কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে ৪০ লাখ টাকা পে করে ঠিকই ডিভোর্স হয়েছে।

বেশি মোহর বিয়ে টেকার ইনসিওরেন্স না, বরং যে বিয়েতে মোহর কম, সে

[১] বাইহাকী—আস-সুনানুল কুবরা—৬/১৬৬ [১১৫৪৫]। সনদ হাসান লিগাইরিহি; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া—৪/৩৮৩

[২] আহসানুল ফাতাওয়া—৫/১৩

বিয়েতে বারাকাহ বেশি। আম্মাজান আয়েশা ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীস, নবীজি বলেছেন, 'কনের বরকতের আলামত হচ্ছে—বিয়ের প্রস্তাবনা সহজ হওয়া, মোহরানা সহজসাধ্য হওয়া এবং গর্ভ ধারণ সহজ হওয়া।'[১] নবীজি ﷺ বলেছেন, 'সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে—সহজসাধ্য মোহরানা।'[২]

মোহর বিষয়টার সামাজিক অনেক প্রভাব আছে। আলিমগণের অনেক কিতাবও পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, হঠাৎ যদি আপনি মারা যান, আপনার স্ত্রী-সন্তান যেন পথে বসে না যায়, কিছুটা আর্থিক সিকিউরিটি ইস্যু। তাই বরের সামর্থ্যানুযায়ী যথাসম্ভব মোহর নির্ধারণ করুন। সামর্থ্যের মধ্যেই বেশিটা। লোক-দেখানোর জন্য সামর্থ্যের অতিরিক্ত মোহর দাম্পত্য বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

অনেকে মোহরে ফাতিমী নির্ধারণ করেন; আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে মোহরে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেছিলেন। মোহরে ফাতিমী রুপার মূল্যের বাজারদর ওঠানামার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে কমবেশ হয়ে থাকে। তাই কোনো পরিমাণকে নির্দিষ্ট মনে না করে প্রয়োজনের সময় বিজ্ঞ কোনো আলিমের কাছ থেকে বাজারদর অনুপাতে চলতি পরিমাণ জেনে নেওয়া কর্তব্য। সামর্থ্যের মধ্যে রিজনেবল ও স্মার্ট কিন্তু পরিমাণটা। তবে আলী-ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কেমিস্ট্রির বারাকাহ পাবার জন্য এটা করা হয়, কেননা এতে স্বয়ং নবীজির অনুমোদন ছিল, সেই হিসেবে। তবে এটাও জরুরি না। জরুরি হলো সামর্থ্যের ভেতরে লৌকিকতা-বিবর্জিত হওয়া। আলিমগণের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না এ বিষয়ে।

---

[১] শুআবুল ঈমান, হাদীস-ক্রম : ৬১৪৬; হাসান সহীহ
[২] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২১১৭, অধ্যায় : বিবাহ। সনদ সহীহ

বাসর রাত

☞ ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিন। দুজনেরই অন্তর জীবনের সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতার সামনে কম্পমান। সহযোগিতার মনোভাব দেখান। কিছুক্ষণ গল্প করে ফ্রি হোন।

☞ সামনের চুলের গোছা ধরে পড়ার একটা দুআ আছে।

اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

> *আল্লাহ, আমি আপনার কাছে তার (স্ত্রী) কল্যাণের প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনা জানাই তার সেই কল্যাণময় স্বভাবের যার ওপর আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি তার অনিষ্ট থেকে এবং তার সেই অকল্যাণময় স্বভাবের অনিষ্ট থেকে যার ওপর আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।*[১]

☞ এরপর বিয়ের পোশাক পরিবর্তন করে ফ্রেশ হবার সুযোগ দিন। সারাদিন হয়তো ভালোভাবে খাওয়া হয়নি। খেয়ে নিন। পারলে খাইয়ে দিন।

☞ দুজনে দুরাকাত সালাত পড়ে নতুন জীবন শুরু করুন। স্ত্রীকে পেছনে নিয়ে জামাতের সাথে সালাত পড়া মুস্তাহাব। আল্লাহর কাছে দুআ করুন একসাথে।

☑ আবু উসাইদের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবু সাঈদ বলেন, 'আমি দাস অবস্থায় বিবাহ করেছিলাম। এবং কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করেছিলাম, যাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবু যার ও

[১] ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম : ১৯১৮, অধ্যায় : বিবাহ। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে সনদ হাসান।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন। সালাতের জন্য ইকামত হয়ে গেল, আবু যার ইমামতির জন্য সামনে এগোলেন। বাকিরা তাঁকে এই বলে থামিয়ে দিলেন—"সাবধান, যাবেন না।" অতঃপর আমি ইমামতি করলাম, অথচ তখনও আমি দাস। সালাত শেষে তাঁরা আমাকে (নতুন বর হিসেবে) শিক্ষা দিয়ে বললেন : "যখন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে আসবে, তখন দুরাকাত সালাত পড়বে। তারপর তার জন্য মঙ্গলের দুআ করবে এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। তারপর তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপার।"'[১]

☑ আবু হারীয নামক জনৈক ব্যক্তি একবার এলেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে। এসে জানালেন, নতুন বিয়ে করেছেন এক কুমারীকে, কিন্তু মনে খচখচ লাগছে, যদি তার ভেতরে অনিষ্টকর কোনো কিছু থাকে। সাহাবী পরামর্শ দিলেন—'যখন সে কাছে আসবে, তাকে জামাত সহকারে তোমার পেছনে দুরাকাত সালাত পড়ার নির্দেশ দেবে।'[২]

☑ সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাসর-রাতে নিজ স্ত্রীকে বলেন, 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, "যেদিন তুমি বিবাহ করবে, সর্বপ্রথম সাক্ষাত করবে আল্লাহর অনুসরণের মাধ্যমে।" সুতরাং তুমি দাঁড়াও, আমরা দুরাকাত সালাত পড়ব। যখন আমাকে দুআ করতে শুনবে, তখন আমীন বোলো।'[৩]

[১] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ—৩/৫৬০ [১৭১৫৩]। সনদ সহীহ।
[২] আবদুল মালিক ইবনু হাবীব (২৩৮ হি.)—আদাবুন নিসা—১/১৫৫; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ—৩/৫৬০ [১৭১৫৬]। সনদ সহীহ। ইবনু শাইবাহ'র বর্ণনায় উক্ত ব্যক্তির নাম আবু জারীর বলে উল্লেখ রয়েছে।
[৩] মুসান্নাফু আবদির রাযযাক—৬/১৯১ [১০৪৬৩]; সনদ বিচ্ছিন্ন। দুর্বল। -শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী—আদাবুয যিফাফ

☞ প্রথম রাতে দৈহিক মিলন করতে পারেন, যদি স্ত্রী সংকোচ বোধ না করে। স্ত্রীর মন বুঝে। প্রথম মিলনের অভিজ্ঞতা যেন তার জন্য বিভীষিকা না হয়। প্রথম মিলন যদি মনে ভীতিকর ছাপ রেখে যায়, তাহলে তার পরবর্তী যৌনজীবনে এর প্রভাব থেকে যেতে পারে। নানান যৌন সমস্যা জন্ম নেবার আশংকাও আছে। ফলে ঘুরেফিরে আপনার নিজের যৌনজীবনেও সমস্যা দেখা দেবে। প্রথম সেক্সে যেন কোনো বাজে অভিজ্ঞতা না হয়। আর প্রথম রাতকে মেয়েরা আজীবন মনে রাখে। এজন্য এমন কিছু করুন, যা মনে হলেই আপনার স্ত্রী প্রশান্তি পাবে।

☞ এজন্য সবচেয়ে নিরাপদ হলো, বিয়ের প্রথম রাতে তাকে বুকে জড়িয়ে **গল্প করুন**। নিজের স্বপ্নগুলো শেয়ার করুন, তার স্বপ্ন শুনুন, দুজন মিলে স্বপ্ন বানান। হামলে পড়বেন না। 'বাসর রাতেই বিলাই মারতে হবে' এটা বাজে প্র্যাকটিস। বিলাই মাত্রই মরণশীল। একাই মরবে, ভূত হবে। সারারাত গল্প করতে পারেন। বারান্দায় যেতে পারেন, গান শোনাতে পারেন। স্ত্রীর সাথে ঠাট্টাতামাশা করার সুন্নাত আমল করতে পারেন। ফজরে ওঠার জন্য ঘুমাতেও পারেন।

☞ দু-একদিন পর যখন আপনি প্রথা অনুসারে শ্বশুরবাড়ি যাবেন, তখন প্রথম মিলনটা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। মানে প্রথম মিলনটা 'বউয়ের পরিচিত পরিবেশে' হলে সহজ হবে আপনার জন্যও, তার জন্যও। বিসমিল্লাহ বলে সহবাস শুরু করা। তারপর শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া। উভয়টিকে একত্রে এভাবে বলা যায়—

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

> *'আল্লাহ! আপনার নামে শুরু করছি, আপনি আমাদের (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের) কাছ থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন। আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবেন, সে সন্তানকেও শয়তান (শয়তানের যাবতীয় আক্রমণ) থেকে দূরে রাখুন।'*[১]

[১] বুখারী, হাদীস-ক্রম : ৩২৭১, অধ্যায় : সৃষ্টির সূচনা।

☞ হানিমুনে যান যত দ্রুত সম্ভব। দ্রুত হানিমুনে যেতে পারলে প্রথম মিলন হানিমুনেও হতে পারে। আসলে আপনার বাসা ও তার বাসায় আত্মীয়-স্বজনের কারণে যে সংকোচটা কাজ করে, হানিমুনে গেলে সেটা থাকে না। একই সঙ্গে ঘরের কাজকাম নেই, 'শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-জা—কে কী ভাবল' টেনশন নেই। দূরে কোথাও যেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আপনার জেলাতেই কোনো রিসোর্ট হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো তাকে মানসিকভাবে ফ্রি করা, ব্যস্ততার দিক থেকে ফ্রি করা। তার মনোযোগকে মিলনের ভেতর কেন্দ্রীভূত করা। এতে করে স্ত্রীকে মিলনের স্বাদ ও অর্গাজম (চরমানন্দ) বুঝানো সহজ হয়, নয়তো প্রথম অর্গাজম অনুভব করতে মেয়েদের বহু দেরি হয়ে যায়। **পারস্পরিক যৌন বোঝাপড়া (সেক্সুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং) দ্রুত হয় হানিমুনে।**

☞ প্রথমবার লিঙ্গ প্রবেশের সময় বেশ ব্যথা পেতে পারে। পরের দু-একদিন ব্যথা থাকতে পারে। তিনবেলা তিনটে নাপা খাওয়াই যথেষ্ট।

☞ মেয়েদের **সতীচ্ছদ পর্দা** নিয়ে সমাজে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। বাসর-রাতে বিছানায় রক্ত না দেখলে মনে খুঁতখুঁত করার কিছু নেই। এই পর্দা খুব পাতলা জিনিস। শুধু সেক্সের জন্যই ছেঁড়ে, এমন না, বরং খেলাধুলা/যোনিতে ইনফেকশন/ঘুমের ভঙ্গির কারণে ছোটবেলায়ই ছিঁড়তে পারে। অনেকের মোটা থাকে বলে ছেঁড়ে না, জাস্ট একপাশে সরে যায়। অনেকের আবার জন্মগতভাবেই থাকে না।[১] সুতরাং রক্তপাত না হলেও স্ত্রীর ভার্জিনিটি নিয়ে অহেতুক সন্দেহ করা মূর্খতা ও ছোটলোকির পরিচয়।

☞ যারা পর্নো দেখে দেখে বরবাদ হয়েছেন, কয়েকটা কথা মাথায় রাখবেন—পর্নোস্টার একজন বেশ্যা, আর আপনার স্ত্রী ভদ্র পরিবারের একজন ধার্মিক নারী।

☑ পর্নো ভিডিও একটা অভিনয়। অহেতুক শীৎকার/তৃপ্তির ভঙ্গি/ঢংঢাং—সব 'অভিনয়'।

[১] ডা. লিমন ক্লার্ক ও ডা. ইসাডোর রুবিন, মেডিকেল সেক্স গাইড

- ☑ ওদের ফুল বডি মেকআপ। স্বাভাবিক মানুষের ত্বক অত মসৃণ-নির্লোম হয় না।
- ☑ পর্নোস্টারদের স্তন সার্জারি করে সিলিকন জেল ঢুকানো।
- ☑ নিতম্ব জিম করে বা সার্জারি করে সুডৌল করা।
- ☑ পুরুষ-লিঙ্গ সার্জারি করে বড় আর মোটা করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে।
- ☑ ওরা কিন্তু একটানা ২০/৪০ মিনিট করে না। একটা ২০ মিনিটের ভিডিও বানাতে হয়তো ৭ দিন শুটিং করেছে।

তাই নিজের স্ত্রীকে ওদের সাথে তুলনা করে হতাশ হবেন না। আর নিজেকে ওদের সাথে তুলনা করেও হতাশ হবেন না। স্বাভাবিক যৌনজীবন একটা নিয়ামত। আল্লাহ্ আপনাকে তা দিয়েছেন। ফ্যান্টাসি করে সেটাকে নষ্ট করে দুনিয়াটা দোযখ বানাবেন না। স্বাভাবিক হোন। স্ত্রীকে ভালেবাসুন। ডুব দিন। আবিষ্কার করুন তার পছন্দ। নিজের পছন্দগুলো তাকে বলুন। তুলে আনুন মুক্তো।

ব্যাচেলরের শেষ-রাত

আমরা কিতাবের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। নিকাহ মুমিনের আমল, কাফিরের খাহেশাত। কাফির নিকাহের দ্বারা নফসের খাহেশ মেটায়—খাহেশ চরিতার্থ করার জন্য যা যা করার করে। মনের খাহেশ, শারীরিক খাহেশ, লৌকিকতার খাহেশ; মনে যা চায় তা-ই করে। আর মুমিন তা-ই করে, যা আল্লাহ চান। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পদ্ধতি মুতাবিক করে। প্রতি পদক্ষেপে নবীজির কর্মপন্থা খুঁজে নিয়ে করে।

কিছুদিন বা কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি একটি আমলের তাওফিক পেতে যাচ্ছেন, অভিনন্দন আপনাকে।

আপনি আর ব্যাচেলর থাকছেন না। ব্যাচেলর-জীবনে যা যা করেছেন, এখন তার অনেক কিছুই আর করার সুযোগ নেই। বন্ধুদেরকে দেবার মতো ঘণ্টার পর ঘন্টা সময় আর নেই। মন চাইল আর একটা কিছু করলাম, এক জায়গায় চলে গেলাম—এমনটা যদি বিবাহিত জীবনেও হয়, তাহলে আপনি বিয়ের অনুপযুক্ত। গায়ে গতরে বেড়েছেন, মন বাড়েনি। আগে আপনার খামখেয়ালিপনায় মা-বাবা কষ্ট পেতেন, দুশ্চিন্তা করতেন; এখন কষ্ট পাবার লোক আরেকজন বেড়েছে। যার জীবন এখন আপনার সাথে গাঁথা, আপনার জীবন আর আপনার একার নয়। আপনার জীবনের সিদ্ধান্তগুলো এখন সরাসরি তাকে ইফেক্ট করে। এজন্য প্রতিটি কাজ এখন থেকে তার সাথে পরামর্শ করে করার চেষ্টা করুন। ব্যাচেলর-জীবনে আমরা কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত থাকি—কথায়, আচরণে, প্রতিক্রিয়ায়, মুখভঙ্গিতে। এখন আপনার ভেতরে নিয়ন্ত্রণ আসতে হবে, আপনার আচরণ কারও দিন-রাত এলোমেলো করে দিতে পারে, তার কাছে আপনার একটা কথা, একটা হাসি, একটা মন্তব্যের মূল্য সারা দুনিয়ার সমান। সুতরাং কী বলছেন, কী করছেন, খেয়াল রাখা চাই। হুট করে সিদ্ধান্ত নেয়া, প্রতিক্রিয়া দেখানো, কিছু একটা বলে ফেলা— জীবনকে অশান্ত করে দিতে পারে। পরস্পরকে চিনুন,

আরেকজনের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকে প্রাধান্য দিন। বিয়ে মানে শুধু শরীরের মিলন না, বিয়ে মনেরও মিলন। মনে মন মেলান। নিজের মনকে কাট-ছাঁট করে তার খাপে মেলান, একজন আরেকজনের পছন্দসই হোন।

পুরো কিতাবে বর্ণিত ফিল্টারে ছেঁকে, আপনার অনেক চোখের পানিতে, শেষরাতের দুআর ফল হিসেবে আল্লাহ যে মানুষটিকে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, তিনি আপনার জন্য আপনার রবের 'উপহার'। এই উপহারের কদর করা চাই। কখনও যেন না-শোকরি, অভিযোগ, বিদ্বেষ না আসে তাঁর প্রতি। আপনি অনেক চেয়ে তাঁকে পেয়েছেন, আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষটিকেই আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন।

মুমিনের দাম্পত্য-জীবনও তার আমল। তার প্রত্যেক অপছন্দনীয় বিষয়ে আল্লাহর দিকেই ফিরবেন—'আল্লাহ! আপনার উপহার আপনিই ঠিক করুন।' তাঁর জন্য আড়ালে দুআ করবেন, আল্লাহ্ তাঁকে আপনার মনের মতো বানিয়ে দেবেন। বিয়ের আগে যেমন আল্লাহর দিকে ঝুঁকেছেন, বিয়ের পরেও ঝুঁকবেন। নিজের জেদের চেয়ে, ইগোর চেয়ে, চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে আল্লাহর রাজিখুশিকে প্রাধান্য দেবেন, আল্লাহই দুজনার চলার পথ সহজ ও প্রশান্তিদায়ক করে দেবেন।

একজনকে আরেকজনের জন্য পরীক্ষা যেন না বানান, সেই দুআ করুন। কখন আল্লাহ স্বামীকে স্ত্রীর জন্য, আর স্ত্রীকে স্বামীর জন্য পরীক্ষা বানান? যার জন্য আপনি আল্লাহর হক নষ্ট করবেন, যাকে খুশি করতে গিয়ে আপনি আল্লাহকে নারাজ করবেন, তাকেই আল্লাহ আপনার জন্য পরীক্ষা বানাবেন। তাকে আল্লাহ আপনার উপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আল্লাহ্ বলেন, মানুষের অন্তর আমার কুদরতী দুই আঙুলের মাঝে।[১] আল্লাহ্ অন্তর-পরিবর্তনকারী। ঐ আল্লাহকে ভয় করি, আসুন, যিনি নিমেষে আমার প্রিয়কে আমার জন্য দোযখ বানিয়ে দিতে পারেন। পরস্পরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার চেষ্টা করুন, আল্লাহ্ও একজনকে আরেকজনের জন্য পাগলপারা করে দেবেন। দেখুন চমৎকার একটা ছবি—যত আপনারা আল্লাহর নিকটে, তত আপনারা পরস্পরে নিকটে। যত দুজনে আল্লাহ থেকে দূরে, তত পরস্পর থেকে দূরে।

নতুন জীবনের শুরুতে দুজনে হৃদয়ের গহীন থেকে নিয়ত করুন—বিগত

[১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম : ১৩৬৯৬

জীবনে যা হয়েছে, হয়ে গেছে। বান্দার হৃদয়ের অতল থেকে আফসোস আর অনুতাপ আসবে, তো মুখে মাফ চাইবার আগেই আল্লাহ আমলনামা সাফ করে দেবেন, ফেরেশতাদের স্মৃতি থেকেও গুনাহ মুছে দেবেন। দুজনেই আল্লাহর দিকে শতভাগ ফিরে আসার ইচ্ছা করুন, শরীর-মন সবকিছু। এই দেহ আর আল্লাহর অবাধ্য হবে না, এই মন আর আল্লাহর অবাধ্য হবে না—সংকল্প করুন। হয়তো পরীক্ষা আসবে, অভাব আসবে, পেরেশানি আসবে; কিন্তু অন্তর আল্লাহর দিক থেকে অন্য দিকে যাবে না। আল্লাহ তখন এমন অনুভূতি দান করবেন, যেন জান্নাতেই একসাথে আছেন। আল্লাহ দুনিয়ার এই 'জান্নাতে'ও দুজনাকে একসাথে রাখুন, আখিরাতের জান্নাতেও একসাথে রাখুন। আমীন।

পরিশিষ্ট : তালাক

দাম্পত্যজীবনে সবচেয়ে স্পর্শকাতর একটি বিষয় হচ্ছে তালাক। এ বিষয়ে প্রত্যেক দম্পতিকে চূড়ান্ত সতর্ক থাকা অপরিহার্য। আমাদের সমাজে তো ঠুনকো মনোমালিন্যের জেরে অনেক দম্পতি তালাক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিংবা সাময়িক দাম্পত্য-কলহে ক্ষুব্ধ হয়ে তালাক দিয়ে বসে। অথচ আলিমগণের ভাষ্য হলো—অতীব প্রয়োজন (যা শরীয়তে ওজর বলে গণ্য) ছাড়া স্বামীর জন্য যেমন তালাক দেওয়া জায়েয নয়, তেমনি স্ত্রীর জন্যও তালাক চাওয়া উচিত নয়।

হাদীসে তালাককে অত্যন্ত ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় একটি কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ﷺ ইরশাদ করেন—

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

> *'আল্লাহ তাআলার কাছে বৈধ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ হলো তালাক।'* [১]

শরীয়তে তালাকের বিধান রাখা হয়েছে কেবল অতীব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য যদি এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পৌঁছে, যেখান থেকে তাদের আর উতরে ওঠা সম্ভব না; অথবা স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, উশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়, কোনোভাবেই তাকে সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে একজন স্বামী তালাকের সিদ্ধান্তে যেতে পারে। তবে তার আগে স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীকে শোধরানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

তালাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে স্বামীকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রমের কথা বলেছে ইসলাম।

---

[১] আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম : ২১৭৮

প্রথম ধাপ :

স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না; বরং নিজেকে সংযত রাখতে হবে এবং কোমল ভাষায় তাকে বোঝাতে হবে। প্রেম ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে তার মন গলানোর চেষ্টা করতে হবে। স্ত্রী যদি কোনো ভুল ধারণায় থাকে, তাহলে তা থেকে তাকে ফেরাতে হবে। সর্বোপরি নিজেকে সংযত রেখে দাম্পত্য-জীবন স্থায়ী করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে স্বামীকে।

দ্বিতীয় ধাপ :

প্রথম ধাপের ব্যবহারে স্ত্রীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন না এলে অবাধ্যতা ও আচরণগত বিচ্যুতির কারণে স্বামী তার প্রতি অভিমান প্রকাশ করবেন। এই অভিমানের জেরে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে রাত্রিযাপন ত্যাগ করে আলাদা বিছানায় ঘুমোতে পারেন।

তৃতীয় ধাপ :

বিছানা পৃথকের পরও যদি মীমাংসা না হয়, তাহলে সে-ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সালিসের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা।

এরপরও যদি মীমাংসা না হয়, তাহলে একজন স্বামী তালাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, তালাক অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেউ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কিংবা ভুল পন্থায় তা প্রয়োগ করলে সে একদিকে যেমন গুনাহগার হবে, অন্যদিকে তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি বিবেচক স্বামীর দায়িত্ব হলো, তালাকের শব্দ কিংবা এর সমার্থক কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করা থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকা।

তালাকের পদ্ধতি : উপরোল্লিখিত ধাপ অতিক্রম করবার পর কোনো স্বামী যদি তালাক প্রদানে বাধ্য হন, তাহলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় শুধু এক তালাক দেবেন। এভাবে বলবেন, 'তোমাকে তালাক দিলাম।' তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দ কিংবা ৩ সংখ্যা ব্যবহার করবেন না। কেউ 'বায়েন' শব্দ বলে ফেললে (চাই

তা এক বা দুই তালাক হোক না কেন) নতুন করে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো ছাড়া স্ত্রীর সাথে পুনরায় মিলনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে তিন তালাক দিয়ে ফেললে (একই মজলিসে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া হোক কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া হোক) যেমন বলল, 'তোমাকে তিন তালাক দিলাম।' অথবা আগে কখনো দুই তালাক দিয়েছিল আর এখন শুধু এক তালাক দিল। সর্বমোট তিন তালাক দেওয়া হলো। যেকোনো উপায়ে তিন তালাক দেওয়া হলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় শুধু মৌখিকভাবে স্ত্রীকে বিবাহে ফিরিয়ে আনার যেমন কোনো সুযোগ থাকে না, তেমনি নতুন করে বিবাহ দোহরানোর মাধ্যমেও ফিরিয়ে নেওয়ার পথ খোলা থাকে না।

একসাথে তিন তালাক দেওয়া কিংবা বিভিন্ন সময় তালাক দিতে দিতে তিন পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া একটি জঘন্য অপরাধ ও ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ তাআলা এর শাস্তি হিসেবে এই বিধান দিয়েছেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পুনরায় একসাথে বসবাস করতে চাইলে স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র তার বিয়ে হওয়া এবং সে স্বামীর সাথে তার মিলন হওয়া অপরিহার্য। এরপর কোনো কারণে সে তালাকপ্রাপ্তা হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হলে ইদ্দত পালনের পর এরা দুজন পরস্পর সম্মত হলে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এজন্য শরীয়ত আগেই এই মর্মে সাবধান করে দিয়েছে যে, প্রথমত তালাকের কথা চিন্তাও করবে না। তবে অতীব প্রয়োজনে কখনো তালাক প্রদানের প্রয়োজন হলে শুধু সাদামাটা তালাক দাও, শুধু এক তালাক। যেন উভয়ের জন্যই নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকে এবং পুনরায় ফিরে আসার পথ খোলা থাকে। এরপর আবারও কোনো সমস্যা দেখা দিলে এভাবেই শুধু এক তালাক দেবে। এখনও ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে।

কিন্তু এরপর যদি আবার কখনো শুধু এক তালাকই দেওয়া হয় এবং সব মিলে তিন তালাক হয়ে যায়, এ অবস্থায় আর তাকে ফিরিয়ে আনারও সুযোগ থাকবে না, নতুন করে বিয়ে করার বৈধতাও বাকি থাকবে না।

দাম্পত্য জীবন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় ও বিশেষ একটি নেয়ামত। স্বামী-স্ত্রী সকলের কর্তব্য, এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং

একে অপরের সকল অধিকার আদায় করা। স্ত্রীর জন্য উচিত নয়, কথায় কথায় স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া। আবার স্বামীর জন্যও জায়েয নয় আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করা। [১]

[১] রচনাটির কিছু অংশ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ'র 'তালাক সম্পর্কিত কিছু ভুলত্রুটি' নামক নিবন্ধ (মাসিক আল কাউসার, জুন, ২০১২) থেকে চয়িত।

লেখক পরিচিতি

শামসুল আরেফীন। পেশায় চিকিৎসক। 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' দিয়ে লেখালেখি শুরু। অন্যান্য বই 'কষ্টিপাথর', 'মানসাঙ্ক', 'কুররাতু আইয়ুন - ১ : যে জীবন জুড়ায় নয়ন', কুররাতু আইয়ুন - ২ : যে জীবন জুড়ায় মনন'। দিনশেষে আল্লাহপ্রদত্ত সমাধানে মানবসভ্যতার ফিরে আসা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই—এ-কথাই ফুটে ওঠে তার লেখায়।

শাইখ মাহমুদ আল-মিসরী। আবু আম্মার নামেও পরিচিত। জন্ম মিশরের কায়রোতে। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-মুকাদ্দাম সহ সৌদি আরব ও মিশরের বিভিন্ন শাইখের নিকট ইলম অর্জন করেন। বর্তমানে ইলমচর্চায় এবং এর প্রচারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছেন। উম্মাহর জন্য রচনা করে যাচ্ছেন হাজার হাজার পৃষ্ঠা।

বিয়ে!

আমাদের সমাজের বিয়েগুলো কতটা ইসলামসম্মত? উত্তর আমাদের সবারই জানা। কেমন হবে একজন মুসলমানের বিয়ে? বিয়ের সময় মুসলিম পাত্র-পাত্রী বা তাদের অভিভাবকদের কী কী বিষয় মাথায় রাখা উচিত? বিয়ের সংকল্প থেকে শুরু করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, পাত্র-পাত্রীর গুণাবলি যাচাই, পাত্র-পাত্রী দেখা, বিয়ের সামগ্রিক কার্যকলাপসহ বাসর রাত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়াদির ইসলামসম্মত গাইডলাইন এই বই।

বিয়ে ইসলামের এমন এক বিধান, যা দেহ-মন-আত্মা-প্রজন্ম-সমাজ-পরিবারের সুস্থতা নিশ্চিত করে। বিপরীতে বিয়ের অনুপস্থিতি বা বিবাহ-প্রক্রিয়ার জটিলায়ন জন্ম দেয় শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা, পরিবার-সমাজে অস্থিরতা, তৈরি করে হতাশাগ্রস্ত অসুস্থ প্রজন্ম; পশ্চিমা সমাজ যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আগাম-সমস্যা এড়ানোর এবং উদ্ভূত-সমস্যা নিরসনের নির্দেশনা রয়েছে। বিবাহ বিষয়েও রয়েছে সুস্পষ্ট ও সবিস্তার গাইডলাইন।

তাই, আমাদের ঘরে ও পরিবারে বরকতময় পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিবাহের যাবতীয় আয়োজন-অনুষ্ঠান ইসলামের গাইডলাইন অনুসারে সম্পন্ন করা উচিত। আর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রত্যেকের অবশ্যপাঠ্য একটি বই 'বিবাহ-পাঠ'।